নরম গরম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য

সম্মানভাজনেষু

হালকা লেখা। অবসরে শুধু পড়ে যাওয়া।
জীবনের নানা সমস্যা। ভারাক্রান্ত মাথায়
মাথা ঘামাবার মতো লেখা না ঢোকালেই ভালো।
যা সহজ, যাতে সমস্যা নেই, শুধু
মজা আছে, সেই লেখাই মনোরোচক।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছায়া না মায়া

রাম কমল

রাম আর কমল, দুজনে মিলে রামকমল। স্টোরি-রাইটার। সিনেমা সাহিত্যকে বলে স্টোরি। ও একটা আলদা লাইন। নাম করা সাহিত্যিক বা গল্পকার হলেই যে হিট ছবি হবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। অনেক সব ব্যাপার আছে। হিট ছবির আলাদা ফর্মুলা আছে। সে সব জানতে হয়। রামকমল এ ব্যাপারে অদ্বিতীয়। পরপর সাতটা স্টোরি হিট করেছে। তারপরই পর পর তিনটে ফ্লপ।

রাম বড়, কমল ছোট।

সকাল হয়েছে। রাম এক কাপ উচ্ছের রস খেয়ে, মুখটাকে ভীষণ বিকৃত করে, সিল্কের লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে বারান্দা বাগানে বসে আছে। পর পর তিনটে ফ্লপ। মনে দগদগে ঘা। নিজের ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। কি হল এই হাতের। পরপর সাতটা হিটের পর, হাত এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল? হাতের দোষ না মাথার দোষ!

রাম বসে বসে ভাবছে, এমন সময় কমল এল, কমল গৌরবর্ণ। চোখমুখ লাল টকটক করছে। কারণ তিনটি স্টোরি যে ফ্লপ করল, তার জন্যে সেও সমান দায়ী। মিকসিংটা ঠিক মতো হয়নি। আঠারোটা বিদেশী কাহিনী থেকে খামচা খামচা নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু জোড় জোড় মেলেনি। কমল সেই কারণে সকালে আধঘণ্টা শীর্ষাসন করে। এক যোগীর নির্দেশ। শীর্ষাসনে মাথা খোলে। ব্যাপারটা কষ্টকর হলেও, করতে হচ্ছে। তা না হলে এই বোলবোলা আর থাকবে না। সুন্দর বাড়ি। সুন্দর গাড়ি। সুন্দরী স্ত্রী।

শীর্ষাসনে এতক্ষণ উল্টে ছিল। সোজা হয়েই ছুটে এসেছে দাদার কাছে। পরনে শার্টস্ আর সাদা গেঞ্জি। কমল বেতের একটা চেয়ার টেনে দাদার মুখোমুখি বসল। উল্টে ছিল বলে

মুখটা টকটকে লাল। কমল বেশ ফর্সা, রামও ফর্সা। কমল বললে,

'বুঝলে দাদা, মাথায় রক্ত না চড়লে বুদ্ধি খোলে না। পরপর সাতদিন শীর্ষাসনের পর আজ রেজাল্ট পেলুম। পরপর তিনটে ছবি কেন ফ্লপ করল বল তো?'

'লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েছেন।'

'তোমার মাথা। লক্ষ্মীর সাবজেক্টই নয় এটা। সরস্বতীর ব্যাপার। শোনো, চোরাই মাল কখনও আসলি মাল বলে চালানো যায় না। সেই ভুলটাই আমরা দুই পাঁঠাতে করেছি।'

'শীর্ষাসন করে তাহলে এই বোধটাই হল, আমরা মানুষ নই পাঁঠা।'

'পাঁঠা তো বটেই, তা না হলে পূর্ব-পুরুষের তেজারতি কারবার ছেড়ে কেউ কলম ধরে! আমাদের ছোটকাকে ত্যাখো, হাল ধরেছিল, এখন হুগলি জেলায় চাষবাস করে কেমন জমিয়ে নিয়েছে! শুনলুম বাড়িতে সুইমিং পুল বসিয়েছে।'

'সুইমিং পুল, না হাতি। ওকে সুইমিং পুল বলে। বাড়িতে একটা ডোবা ছিল, সেইটারই চারপাশ বাঁধিয়ে গোটা কতক সিমেন্ট জমানো চেয়ার ফেলেছে। ওই বলে না, বাঁশ বনে শেয়াল রাজা!'

'শুনলুম সন্ধেবেলা ওরই ধারে বসে একটু ঢুকুঢুকু করে।'

'আরে সে দিশি মাল। বিলিতি চাষার মুরোদ নেই। স্কচ খেয়েছে গাধাটা! হোয়াইট হর্স, জনি ওয়াকার, শিভাস রিগ্যাল!'

'সে তুমি যাই বল, দিশিই খাক আর বিলিতিই খাক, আমাদের চেয়ে বেশ সুখেই আছে। পুকুরের মৎস্য, খেতের শস্য। তুমি হলে রাম ছাগল আমি হলুম দিশি ছাগল। তা না হলে কেউ সিনেমার লাইনে আসে। থার্ড ক্লাস ব্যাপার।'

'শোন কমলা। ওই সব মন খারাপ করা কথা ছেড়ে কাজের কথায় আয়। কি আইডিয়া এসেছে বল?'

'প্রথম আইডিয়া হল বিদেশী কাহিনী স্বদেশী মোড়কে চলবে

না। শতকরা একশো ভাগ দিশি জিনিস ছাড়তে হবে। তোমার ঐ যে প্রেমের স্টোরি, যেটা কোনরকমে তিনদিন চলল তারপর হাউস আর টানতে পারল না, কেন জানো? তোমার নায়িকা বিদেশী, তোমার নায়ক বিদেশী, শুধু নামটাই দিশি। তাদের কাণ্ড কারখানা, কথা বলার ধরন, প্রেম করা, জীবনের সমস্যা, সবই বিদেশী।'

'কি যে বলিস! প্রেম জিনিসটাই বিদেশী। দিশি জীবনে প্রেম আছে? বাপ মা হয় একটা ছেলে না হয় একটা মেয়ে ধরে এনে দেবে, নাও এবার সারা জীবন ঘর করো।'

'তোমার ঘটে কিছু নেই, যা আছে সব ভুঁড়িতে। রামী চণ্ডীদাস, বিদ্যাসুন্দর, বিল্বমঙ্গল পড়োনি?'

'পড়ব না কেন? বাঙলা সিনেমা তো ওসব চটকে চটকে শেষ করে দিয়েছে।'

'করুক না। তুমি নতুন করে চটকাও। ময়ান দিয়ে বেশ খাস্তা করে ছাড়। আরও সেক্স চড়াও।'

'সেনসার বসে আছে। কেটে ছেঁটে শেষ করে দেবে। সেই ন্যাড়া বস্টুমীকে কেউ নেবে!

'সেক্স নেবে না! তোমার মাথায় কি আছে দাদা?'

'আরে গাধা নেবে না কেন? সেক্স ঢোকাতে দেবে না।'

'তুমি সেক্স বলে ঢোকাবে কেন? তুমি অ্যান্টি-সেক্স ছবি করো।'

'সে আবার কি?'

'অ্যায়, একেই বলে শীর্ষাসনের সুফল। যেমন ধরো, তুমি প্রমাণ করবে চুম্বনের কুফল। চুমু খাওয়া খুব খারাপ। কেন খারাপ! এইবার সেইটা ধাপে ধাপে উদাহরণ-সহ পেশ করো। এইটা করতে গেলেই তোমাকে একের পর এক চুম্বন দেখাতে হবে। গল্পটা কি রকম হবে! নায়ক। টিন-এজার। সে খুব বিদেশী ছবি দেখে। কি দেখে?'

'বিদেশী ছবি দেখে।'

'অ্যায়, তোমার রাস্তা খুলে গেল। বিদেশী ছবিতে কি দেখে! চুম্বন। কথায় কথায় চুম্বন। নায়ককে এবার বিভিন্ন হুট ছবির কাটা কাটা বাছা বাছা দৃশ্য দেখাও। এই দেখে নায়কের কি হল!'

'মাথা খারাপ হয়ে গেল।'

'ঠিক মাথা খারাপ নয়, হয়ে গেল চুমু পাগল। সে একের পর এক মেয়ের সঙ্গে ভাব করে, আর জাপটে ধরে সাপটে চুমু খেতে যায়। প্রথমে একদিন তার দিদিকে খেতে গেল। দিদি মারলে এক চড়। সেইদিন থেকে দিদির সঙ্গে শত্রুতা। এইটাকে তুমি তখনকার মতো সরিয়ে রাখো, পরে মূল কাহিনীতে কাজে লেগে যাবে। একে বলে কাহিনীর বীজধান। পরে এর থেকে চারা বেরোবে। তুমি কি জানো, গল্প লেখা আর হাল চাষ করা এক জিনিস। প্রথমে আগাছা ভরা জমি, নিড়েন দিয়ে সাফ করো। তারপর নামাও লাঙল। জমি কোদালও। তার মানে সমস্যা তোমার মাথায় একটা জিনিস আসে না কেন, জমিকেও ইংরিজিতে প্লট বলে, গল্পের গল্পাংশটাকেও প্লট বলে। গল্পের প্লটকে সমস্যার লাঙলে ফেলে কোদলাও। এইবার ঘটনা। ঘটনা হল বীজধান সেই বীজধান ছড়িয়ে দাও। গোড়ায় দাও জীবনদর্শনের সার। লকলকে চারা। কাহিনীর প্রকৃতি হল নিয়তি। বন্যা, খরা, চাঁদের আলো, সোনা রোদ। হয় সব ভেসে যাবে, নয় সব জ্বলে যাবে, নয় মাঠ ভরে যাবে পাকা ধানে। বুঝলে কিছু?

'শীর্ষাসন কি করে করে রে?'

'তোমার দ্বারা হবে না। ভেবে ভেবে আর খেয়ে খেয়ে অ্যায়সা মোটা হয়েছ! তোমার ভয় কি, আমি তো আছি। সকালে একবার করে ওল্টাবো মানে নিজেকে উল্টে রাখব আর মধুর মতো আইডিয়া গড়িয়ে আসবে মাথার মৌচাক থেকে।'

'আচ্ছা বল, এইবার ওই চুমু পাগলার কি হবে!'

'চুমু পাগলা একদিন নির্জনে বন্ধুর বোনকে চুমু খেতে যাবে।

খেতে গিয়ে জুতোপেটা খেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসবে। এটাকেও তুমি তুলে রাখো, পরে কাজে লাগবে। বীজধান নাম্বার টু। এরপর ছেলেটা ক্ষেপে গিয়ে একদিন চলে যাবে বেশ্যালয়ে।

'বেশ্যালয়ে।'

'অফকোর্স। সব নদী যেমন সাগরে যায়, সব সিনেমারই মহাসঙ্গম হল নাইটক্লাব, ক্যাবারে, বেশ্যালয়ে। ছ্যাখো না, বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা হচ্ছে স্টেজে, সেখানেও ঢুকে যাবে ক্যাবারে। আমাদের চুমুপাগলা বেশ্যালয়ে ঢুকছে। সেই সময় ঢোকাও বিবেকের গান, ওপথে বাড়াসনে পা। ওপথে বাড়াসনে তুই পা। এইখানে তুমি কিছু কাজ দেখাতে পারবে। নায়কের বিবেকের তাড়না। মুখ ডিজল্‌ভ করে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে কাট শট, অতীতে দেখা বিদেশী ছবির চুম্বনদৃশ্য। দিদির চড়। বন্ধুর বোনের জুতো। সঙ্গে বিবেকের ব্যাকগ্রাউণ্ড—ও পথে বাড়াসনে তুই পা। চালিয়ে যাও, পনের কুড়ি মিনিট। ফিরে আয়, ওপথে বাড়াসনে তুই পা। হঠাৎ নায়কের গলায় চিৎকার, ফিরে যায়, জুকোতে—না না, ফিরবো না। ওভারল্যাপিং গান আমি যাবই, আমি যাবই। এই তোমার কাহিনীতে ডেসটিনি ঢুকে গেল। নিয়তির হাতে চলে গেল। চুমুপাগল বেশ্যালয়ে বিছানায়। কাট। খবরের কাগজ। হেড লাইন, ভারতে এইডস এসেছে। কলকাতায় ব্যাপক ব্যবস্থা। মাদ্রাজ আক্রান্ত। ডকুমেন্টারি শট। খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জ এলাকায় গণিকাদের রক্ত দেওয়া হচ্ছে। টাইমের পাতার ছবি দেখাও। রক হাডসন। এইবার দেখাও মিডিসিনের ক্লাস, ছাত্র শিক্ষকে প্রশ্নোত্তর। এইডস কি? কেন হয়? হোমোসেক্সচুয়ালিটি কি! সমকামীতা ব্যাখ্যা করো। ইতিহাসে চলে যাও। গ্রীস, রোম, মিডল ইস্ট। লরেন্স অফ অ্যারেবিয়া। গে কাকে বলে। হলিউডের গে এরিয়া। কি মনে হচ্ছে দাদা!'

'মনে হচ্ছে, ধান ভানতে শিবের গীত।'

'মনে হচ্ছে তো। তাহলেই জানবে হিট করবে। তোমার

সেই গানটা মনে আছে, গিরীশচন্দ্রের লেখা কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। বাঙলা ছবি আর মানুষের জীবন, দুই-ই একরকম না হলে জীবনধর্মী ছবি করা যায়! আজকাল দর্শকরা জীবনধর্মী ছবি চায়। তোমার যে কবে বুদ্ধি হবে দাদা! আসল জীবন কি রকম?'

'আসল জীবন? আসল জীবন আবার কি রকম? এই যেমন ধর, আমি! চেয়ারে বসে আছি। একটু আগে চা খেয়েছি। একটু পরে এই চেয়ারটা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করব। সেই ছেলেটা আসবে তেল মালিশ করতে। আমি ওই জায়গাটায় চিৎপাত হয়ে পড়ব। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে আচ্ছা করে তেল মাখাবে…।'

'বাশ্‌ বাশ্‌ আর না সিনেমা লাইনের বড় বড় ঘ্যাম লোকেরা মাসাজ করায় এ খুব জানা তথ্য। ভোরে গাড়ি চেপে মর্নিং-ওয়াক করে, সিনেমা পত্রিকার কল্যাণে সবই জানে। তোমার এই বর্ণনাটাই হল প্রকৃত ধান ভানতে শিবের গীত। জীবন হল, তুমি জন্মাবে, তুমি মরবে, মাঝখানটা এলোমেলো জল তরঙ্গ। সেতার বাজনার মতো। ম্যাও বলে শুরু হল, তারপর ঝিনকিনি, কিনি-কিনি। চলল ফাটাফাটি, লাঠালাঠি। তিনটে তেহাই মেরে শেষ।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। তূই কি চাস, বুঝেছি। জীবনধর্মী করতে হলে ওই চুমুপাগলাকে এইডস ধরাতে হবে আর ধীরে ধীরে মেরে ফেলতে হবে।'

'তোমার মাথা। নায়ক মরে গেলে বই ফ্লপ করে।'

'তোর মাথা। বাঙলা ছবিতে শেষ দৃশ্যে হিরাকে মারতেই হবে। পর্দা জুড়ে চিতার আগুন লকলক করবে আর গম্ভীর গলায় একজন সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াবে চিবিয়ে চিবিয়ে, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি। ওই যে রে, নেতারা মারা গেলে রেডিও যেমন করে।'

'শোনো দাদা, শুধু বাঙলাটা ভেবো না, হিন্দিটাও মাথায় রাখো। হিন্দি ছবির হিরো কি রকম জানো. কুমীরে গিলে ফেললে

পেটের ভেতর থেকে কেটে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসে, আবার এমনও হতে পারে, কুমীরটা আগে হয়তো একটা মেয়েকে গিলেছিলো, সেই মেয়েটাও নায়কের হাত ধরে ধিতিং ধিতিং করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসে। ধরো, নায়ক একটা বিশাল পাহাড়ের মাথা থেকে পড়ে গেল, কিন্তু মরবে না। কোথায় পড়ল ? নিচে একটা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছিল, পড়ল তার পিঠের ওপর। পড়া মাত্রই ঘোড়া ছুটল টগবগিয়ে। সোজা নায়িকার বাগান বাড়িতে। নায়কের বিরহে নায়িকা কাঁদছে, চোখের ধারায় ছোট মতো একটা নদী তৈরি হয়েছে, সেই নদী এঁকে বেঁকে বাগানের ভেতর দিয়ে বহে চলেছে। নায়িকা শুধু কাঁদছে না, গানও গাইছে। একটা দুটো করে ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ তেল চুকচুকে বাদামী ঘোড়া টুকুস করে সেই নদী পেরিয়ে একেবারে সুন্দরীর সামনে। ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে লাগল, 'ম্যায় আয়া হুঁ, ম্যায় আয়া হুঁ, মেরা খুশবু।'

'চোখের জলের নদী! মানে বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে কমলা। লোকে ছ্যা ছ্যা করবে।'

'তোমার কোনও ধারণা নেই দাদা। হিন্দি ছবিতে কোনও কিছু অসম্ভব নয়। পুরুষও পোয়াতি হতে পারে।'

'অনেকক্ষণ তো লেকচার হল। আসল কথাটা কি। বাঙালীর শুধু ব্যাড়ব্যাড়ানি।'

'আসল কথা হল, আমি একটা চুটিয়ে প্রেম করি আর তুমি সেইটা দেখে ধাপে ধাপে একটা গল্প লেখো। তারপর ছ্যাখো, একেবারে হাডিল ফুস।'

'হাডিল ফুস মানে ?'

'আর বোলো না, শীর্ষাসনে উল্টে থাকি তো তাই মাঝে মাঝে কথাও উল্টে যায়। ওটা হাউস ফুল হবে। আর তুমি ঢুলে ফোল হয়ে যাবে। না না ঢুলে ফোল নয়, ফুলে ঢোল।'

জন্তু ছবির চিত্রনাট্য

'কি ধরনের গল্প চান ?'

প্রশ্ন করে আমি চায়ে চুমুক দিলুম। আমার উল্টো দিকে ছবির প্রডিউসার আর তরুণ ডিরেক্টার। প্রডিউসার ভদ্রলোক— এর আগে কোনও ছবি প্রডিউস করেন নি। হিমঘরের মালিক। কোন জেলায় মনে হয় গোটা দুই কোল্ডস্টোর আছে। আলু ঢুকিয়ে, আলু চেপে রেখে, অচল আলুকে সচল রেখে, আট আনার মালকে তিন টাকায় তুলতে সাহায্য করে, নিজের চেহারাটাকে বেশ রাঙা আলুর মতো করে ফেলেছেন। অঢেল পয়সা হয়েছে। সেই কাঁচা টাকা এখন ছায়াছবিতে লাগাতে চান। এতকাল আকাশে ছিল আলু এইবার সেই আকাশ তারকাখচিত হবে। হিরো, হিরোইনদের সঙ্গে একটু গা ঘষাঘষি হবে।

প্রডিউসারের কথার এখনও আড় ভাঙেনি। বেশ 'স'-এর দোষ আছে। ঠোঁটে সিগারেট। ইংরেজি ছবির নায়কদের মতো বাঁকা করে ধরা। বললেন, 'এমন একটা মাল ছাড়ুন, যা আগে কেউ ছাড়েনি।'

'সবই তো ছেড়ে বসে আছে। অবশ্য আপনার লাইনটা এখনও খোলা আছে। আলুর লাইনে কেউ কাজ করেনি।'

'আলু! আলুর বিষয়ে ছবি! কি যে বলেন আপনি! আলুতো এগ্রিকালচার!'

'আরে মশাই এগ্রিকালচারই তো আমাদের আসল কালচার। পার্ল বাকের নাম শুনেছেন? তিনি গুড আর্থ বলে একটা বই লিখেছিলেন। সেই বই সিনেমা হয়েছিল। সে এক অসাধারণ ছবি। সেও ওই জমি, কৃষি।'

'তাহলে ওইটা ঝেড়ে একটা নামান না।'

'দু ভাগে করতে হবে। ছ ঘণ্টার বই। রাজকাপুরের মেরা নাম জোকারের মতো।'

'ছঘণ্টা ! তাহলে থাক।'

'আলু কিন্তু ভালো সাবজেক্ট। আপনি হবেন ভিলেন। গল্পটা এইরকম হবে, এক কৃষক আর কৃষক বধূ। সবে তাদের বিয়ে হয়েছে। প্রেম করে বিয়ে। কৃষক যুবকটি ভাল গান গায়। ধরুন প্লে ব্যাকে কিশোরকুমার। যুবকটি গ্রামের জলসায় গান গেয়ে মেয়েটির হৃদয় জয় করে নিয়েছে। দু'জনের আড়ালে আবডালে দেখা হয়। ছেলেটি গায়। মেয়েটিও গায়। মেয়েটির প্লেব্যাকে লতা মঙ্গেশকর।'

'না না, আশা ভোঁসলে।'

'বেশ তাই হোক। দুজনের মেলামেশা নিয়ে গ্রামে দক্ষযজ্ঞ। এক জমিদারের ছেলের নজর ছিল মেয়েটির দিকে। সে তার লোকলস্কর লাগিয়ে মেয়েটাকে একদিন বেলা শেষের মাঠ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে।'

ডিরেক্টার ছেলেটি বললে, 'এখন তো জমিদার নেই।'

'জমিদারের বদলে জোতদার। আজকালকার প্রগতিশীল নাটকে জোতদার থাকবেই। মনে আছে—অজিতেশবাবু কি রকম অভিনয় করতেন জোতদারের ভূমিকায়। জমিদার নেই তো কি হয়েছে, জোতদারের তো ছড়াছড়ি। এই দৃশ্যে আমরা পনের মিনিটের একটা রেপ সিন ঢুকিয়ে দি। তাহলে প্রথম আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা গোটা তিনেক গান, গোটা চারেকও হতে পারে, ইচ্ছে করলে এক রাউণ্ড নাচ আর একটা বেশ জমাটি নাচ সমেত রেপ স্যাটা স্যাট ঢুকিয়ে দর্শকদের একেবারে চেয়ারের সঙ্গে পেরেক মারা করে ফেলব।'

প্রডিউসার ভদ্রলোক, সিগারেটে একটা বোম্বাই টান মেরে বললেন, 'আমার তো মশাই শুনেই মনে হচ্ছে জমে উঠেছে।'

'এ সব কাহিনীর মার নেই। এর বাপ জমবে। ভাল রান্নার যেমন মশলা থাকে, ভাল কাহিনীরও যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত কিছু মশলা আছে। বিরিয়ানির মতো। সাজিরে, সামরিচ, জায়ফল,

জৈত্রি। জমি মানে মাটি, মেয়েছেলে, প্রেম, কামনা, শক্তি আর ব্যভিচার, এ যে কি মশলা, একেবারে মুর্গমসল্লম, আর কোন্ কলাপাতায় পরিবেশন করা হচ্ছে? গ্রামীন সংস্কৃতির কলাপাতের একেবারে ফেটে ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে?'

প্রাডউসার বললেন, 'তারপর, তারপর!'

'তারপর মনে করুন ভোর হচ্ছে। আকাশ লাল। এই জায়গায় একটু ক্যামেরার কেরামতি দেখাতে পারেন। দুটো পৃথিবীর তুলনা পাশাপাশি রাখতে পারেন। পবিত্র আর অপবিত্র। গোমুখসে প্রবাহিত গঙ্গা। গোমুখী থেকে গঙ্গা নেমে আসছে। ঋষিরা সব সমাগান করছেন।'

'এখন তো আর ঋষি নেই!'

'কে বলেছে আপনাকে! ঋষিদের জায়গায় ঋষিরা ঠিকই আছেন। এদিকে জোতদার যেমন বাড়ছে ওদিকে ঋষিরাও তেমনি বাড়ছেন। পাপ আর পুণ্যের মধ্যে সব সময় একটা ব্যালেন্স্ থাকবেই। এরপর লছমনঝলা অলকানন্দা হয়ে হরিদ্বার। হরিদ্বারে সম্প্রতি যে কুম্ভ হয়ে গেল তার দৃশ্য, স্টকশট কিছুটা জুড়ে, বেনারস হয়ে, সোজা আমাদের গ্রামে। ভোর পুণ্যের পৃথিবীতেও হচ্ছে, ভোর পাপের পৃথিবীতেও হচ্ছে। গ্রামে এসেই ক্যামেরা প্রথমে চার্জ করছে একটা টলটলে পুকুরে। সত্যজিত বাবুর পথের পাঁচালি সব সময় স্মরণে রাখবেন। অমর। সেই আদর্শে পুকুর। পুকুরে পদ্ম।'

'পদ্ম কি থাকে' আমি তো কচুরিপানা ছাড়া কিছুই দেখি না।

'ধ্যার মশাই, সে তো হল গিয়ে বাস্তবের পুকুর। সিনেমার পুকুরে পদ্ম ছাড়া কিছুই থাকে না। সেই পদ্মে ভোরের আলো। এই জায়গায় জলতরঙ্গ। একটা জল ফড়িং কুচিপুডি ড্যান্স্ করছে, পিড়িং, পাড়াং আর জলতরঙ্গ বাজছে। ওপাশে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে একটা বক। এটা হল প্রতীক। পুকুর, পদ্ম, ফড়িং, জলতরঙ্গ হল পুণ্যের প্রতীক আর বক হল পাপ। বক হল জোতদার।

পুণ্যের জীবনকে তছনছ করার জন্যে বসে আছে এক ঠ্যাঙে। ধৈর্য ধরে। দু একটা প্রতীকী দৃশ্য থাকলে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া সহজ হয়। শুধু বকস অফিস দেখলে হয়। পুরস্কার টুরস্কারের কথা ভাবতে হবে না ;

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিক, সে তো ঠিক।'

'এইবার কেবল কাট, কাট, কাট।

'সে আবার কি ?' ডিরেক্টারের অবাক প্রশ্ন।

সে কি, ছবি করতে নেমেছেন, কাট জানেন না। পুকুর, পদ্ম, ফড়িং, জলতরঙ্গ। কাট। ক্যামেরা সরে গেল। এক ঠ্যাঙে দাঁড়ানো বকের ক্লোজ আপ! কাট। বকটা পুকুর থেকে একটা মাছ খপাং করে তুলে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ক্যামেরা বকটার উড়ে যাওয়া বকের চোকে দেখাচ্ছে।'

ডিরেকটার ছোকরাটি উৎসাহিত হয়ে নড়েচড়ে বসলেন, 'সেটা কি জিনিস ?'

সেটা হল, বকটি মাছ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে তো, তার চোখটা কোথায়, নিচের দিকে। প্লেন যখন খুব নিচু দিয়ে উড়ে যায়, আর আমরা যদি জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকাই, দেখব, মাঠ ঘাট, পুকুর নদী সব পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে। আপনি করবেন কি ক্যামেরাটাকে উঁচুতে ঝুলিয়ে' বক যেদিকে গেল সেদিকে এগিয়ে যাবেন। ঝোপঝাড় গাছপালা, সাঁই সাঁই, পেছন দিকে ছুটছে। হঠাৎ !'

ডিরেকটার বললে, 'হঠাৎ! হঠাৎটা কি ?'

'হঠাৎ ক্যামেরার চোখে পড়ল ঘাস ঢাকা জলাতে সাদা মতো কি একটা পড়ে আছে। ক্যামেরা থেমে পড়ল। ক্যামেরা এইবার ধীরে ধীরে নেমে আসছে সেই সাদা বস্তুটির দিকে। একটি মেয়ের দেহ। মুখ। ছেঁড়া খোঁড়া শাড়ি জড়ানো ক্ষত বিক্ষত একটি দেহ।'

'খুন ?'

'না না খুন করলে তো হয়েই গেল। খুন নয়। জোতদারের

ছেলে সেই মেয়েটার ওপর সারারাত অত্যাচার করে ভোরে ফেলে দিয়ে গেছে। এই জায়গায় আমাদের দারুণ স্কোপ। যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ নানা ভাবে দেখানোর সুযোগ আমরা ছাড়ব কেন?'

প্রডিউসার ভদ্রলোক মহোৎসাহে বলে উঠলেন, 'মার কাটারি। তারপর।'

'ক্যামেরার চোখ ওই দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখিয়েই, কাট। কাট করে চলে গেল গ্রামের পথে। এইবার বলুন তো, সকালবেলা সিনেমার গ্রামের পথে কি থাকবেই থাকবে?'

'গরু।'

'হল না। বাউল। বাউল ছাড়া গ্রামের পথ হয়। বুঁই বুই করে একতারা বাজাতে বাজাতে নেচে নেচে আসছে বাউল। মাঝে মাঝে গাইছে, 'বিধি, তুমি বিচার করলে না। বুঁই বুঁই। বাউল আসছে। আর জানবেন, যাত্রায় বিবেক আর সিনেমায় বাউলের এক ভূমিকা। সেই বাউল নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে, বুঁই বুঁই করতে, স্পটে, যেখানে অচৈতন্য ধর্ষিতা মেয়েটি পড়ে আছে।

বাউল মেয়েটির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। মুখটা একবার ভারতবর্ষের ম্যাপ হবে, একবার মুখ হবে। ম্যাপ মুখ, মুখ ম্যাপ, ম্যাপ মুখ, মুখ ম্যাপ।'

'এর মানে?'

'হায় ভগবান! সিনেমা করতে এসেছেন, সিনেমার প্রতীকী ভাষা বোঝেন না! ভারতমাতা এইভাবে ধর্ষিতা হচ্ছেন আজ। বাউল দেখবে না মেয়েটি বেঁচে আছে না মরে গেছে। সে আগে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচবে আর গাইবে।

দেখলাম এ সংসার ভোজবাজীর প্রকার
দেখতে দেখতে ওমনি কেবা কোথায় যায়।
মিছে এ ঘরবাড়ী মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়॥

তারপর সে মেয়েটির জ্ঞান ফেরাবে। কাট।

'এইখানে কাট করবেন?'

'হ্যাঁ, কাট করেই, পরের দৃশ্য। মেয়েটির প্রেমিক ছুটে আসছে। সে ডাকছে, তারা, তারা। ইকোতে শোনাচ্ছে, তারা আ, তারা আ আ আ। সে পাগলের মতো ছুটে আসছে। এই জায়গায় ট্রিকশট। ছেলেটিকে বিশাল বড় দৈত্যের মতো দেখাবে। ঘাসপাতা, ডালপালা থেঁতলে যাচ্ছে পায়ের চাপে। পাখি উড়ে পালাচ্ছে: কাঠবেড়ালি পিড়িক পিড়িক করে ছুটছে। আতঙ্কে ত্রাসে।'

'এই রকম কেন হবে?'

'এইটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ। বোঝানো হচ্ছে, প্রেমের শক্তি পীড়নকারীকে একদিন ফেঁড়ে ফেলবে। ঘৃণার পৃথিবী, নিষ্ঠুর পৃথিবীকে পিষে ফেলবে একদিন। কাট। কাট করেই ক্যামেরা ধরছে একটা লরি। আলু বোঝাই লরি হাইওয়ে ধরে চলেছে। লরির পেছনে লেখা, বুরি নজর বালে তেরা মু কালা। লরি যাচ্ছে, যাচ্ছে। কোল্ড স্টোরেজ। সেই জোতদারের ছেলেটা অফিসে বসে, হ্যা হ্যা করে হাসছে। কৌটো খুলে মুখে মশলা ফেলছে। কাট। প্রেমিক একটা ঠেলা গাড়িতে তার প্রেমিকাকে শুইয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে শহরের হাসপাতালে। পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে একটি বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি হল মেয়েটির ভাই।'

প্রডিউসার বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি লিখে ফেলুন। শেষটা কি করবেন?'

'আপনি শেষের কথা ভাবছেন। ছবি তো এখনও শুরুই হল না। মেয়েটা পাগল হয়ে যাবে। ছেলেটি মেয়েটিকে ভাল করবে।'

'কি ভাবে?,

'গান শুনিয়ে। পরপর গান শোনাবে। গীত, গজল, রাগ প্রধান, পল্লীগীতি, শেষে দেশাত্মবোধক। মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান। মেয়েটি ভাল হবে, কিন্তু তার চরিত্র পাল্টে যাবে। হয়ে যাবে টেররিস্ট। একের পর এক যত পাপের ঘাঁটি আছে সব উচ্ছেদ করতে থাকবে। ছেলেটাও হয়ে যাবে টেররিস্ট। আর প্রেমের প্যানপ্যানানি নয়, পুরোপুরি ইংরিজী

ছবি। গ্রামের পর গ্রাম দখল করে আদর্শ একটা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। এইবার নায়কে ভিলেনে লড়াই। ভিলেনের কোল্ড স্টোরেজে আগুন লাগিয়ে দেবে জনতা। ওরা গুলি চালাবে, এরা চালাবে তীর। ওরা ছুঁড়বে বোমা, এরা ছুঁড়বে আলু। শেষে ভিলেন পাহাড় প্রমাণ আলু চাপা পড়ে মারা যাবে।

'আলু চাপা পড়ে?'

'হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত কোনও সিনেমায় কোল্ড স্টোরের ভেতর লড়াই হয়নি। পাহাড়ে হয়েছে। ছাদে হয়েছে। ছাদের কারনিসে হয়েছে। গুদমে টিনের ব্যারেলের ফাঁকে ফাঁকে হয়েছে। মদের পিপের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হয়েছে, কারখানার যন্ত্রপাতির মধ্যে হয়েছে, জাহাজের ইঞ্জিন ঘরের মধ্যে হয়েছে। হয়নি জ্বলন্ত হিমঘরে। নায়কে ভিলেনে হিমঘরে লড়াই চলেছে, হঠাৎ চারপাশ থেকে আলুর র‍্যাক ভেঙে পড়ল। পোড়া আলু চাপা পড়ে ভিলেন আলু পোড়া। তাকে উদ্ধার করা হল। সারা গায়ে আলুর মতো বড় বড় ফোস্কা। তাকে রাখা হল খাঁচায়। খাঁচায় গায়ে নোটিশ, জন্তু। সেই খাঁচার বাইরে, নায়ক আর নায়িকা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে প্রেম করছে, নায়ক বাঁশি বাজাচ্ছে। আর চারদিক থেকে ছুটে আসছে মালা হাতে গ্রামবাসী। দু'জনের বিয়ে দিয়ে ছবি শেষ। বিয়ের ভোজ, টন টন আলু পোড়া। ছাড়াচ্ছে, নুন মাখাচ্ছে আর টপাটপ মুখে পুরছে।'

'দারুণ, দারুণ।'

'তাহলে পাঁচ হাজার অ্যাডভানস করুন। পরে দশ হাজার।'

'কি যে বলেন! বাঙলা ছবির কাহিনীকারকে কেউ টাকা দেয় না কি? দোব বলে, ঝুলিয়ে রাখে। আপনি লিখে ফেলুন। পাঁচ হাজার এক টাকার, এক টাকাটা রাখুন।'

বাইরে কেঁচোর পত্তন
ভেতরে ছুঁচোর কীর্তন

—প্রবাদ

আকাশ এই সময় কেমন নীল হয়ে ওঠে। ভেসে আসে খণ্ড-খণ্ড মেঘ। উদাস আর মন্থর। মন যেন কেমন করতে থাকে। মনে হয় ওই আকাশেই যদি ঘর-বাড়ি করা যেত। ওইখানেই পাতা হত পূজার আসন। দেবীর বেদী। মাটির পৃথিবীর কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না তাকাতে। পৃথিবী বড় হতাশ করছে। মানুষের বেহিসেবী-দাপটে বেঁচে থাকার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে এসেছে।

ধন, জন, অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, খ্যাতির কোনও দাম নেই। মানুষ ভালবাসতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়। বিশাল মানব-গোষ্ঠীকে নিয়ে একটা পরিবার গড়তে চায়। নিরাপত্তা চায়। এই মারামারি, কাটাকাটি, দেশসেবার নামে ভণ্ডামি, মুখে বলছে, এক করছে আর এক। এই সবই দেখতে দেখতে মনে হয়, মানুষের সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বড় রকমের তামাশা। প্রাণী হিসেবে মানুষ খুব একটা উৎকৃষ্ট কিছু নয়। অকারণে নিষ্ঠুর। বোধ-বুদ্ধি শূন্য। আত্মম্ভর। কল্যাণ, অকল্যাণের ধার ধারে না। সব সময় অভিনয়। চরিত্র বলে কিছু নেই। যার সুযোগ আছে, সে কেবল নিজের কোলে ঝোল টেনে চলেছে।

অসুরের চরিত্র আছে, সে বীর। মনে-প্রাণে অধার্মিক। সে যা করে, তা বিশ্বাস করে। মানুষ অসুরও নয়, দেবতাও নয়। দেবতা হতে চায়; কিন্তু বিশ্বাস নেই, নিষ্ঠা নেই, সাধনা নেই। মানুষ হল অসুরের ক্রীতদাস। প্রবৃত্তির কাছে বিকিয়ে বসে আছে। নীচ সত্তা যে আদেশ করবে তাই পালন করতে বাধ্য।

পূজা শব্দের অর্থ তাহলে কি? তার পূজা, কিসের পূজা। মূর্তি হল গুণের আকর। মাটি লেপা, খড়ের পুতুল নয়। যাঁর পূজা

করছি তাঁর কিছু গুণ যদি আমরা ধারণ করতে না পারি তাহলে আমরা আবার কিসের ধার্মিক, যেমন ধার্মিক। দেবী দুর্গা হলেন শক্তি। শুভ শক্তি, যিনি অশুভকে নাশ করেন। আমরা কি সেই শক্তির কণামাত্র আহরণ করতে পেরেছি? এত হিংসা, এত দানবীয় দাপাদাপি চারপাশে ; এত দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, নিপীড়ন! কেন? ভারত নাকি পুণ্যভূমি, ধর্মের দেশ! অনেক পুণ্য ফলে মানুষ এদেশে জন্মায়।

জন্মে কি হয়! জানোয়ার হয়! সারাটা জীবন বড় বড় কথা শোনে। প্রতিশ্রুতির ভারে নুয়ে পড়ে। সমস্যার পর সমস্যা। কোন সমস্যারই সমাধান নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষকে কিছু দেবার জন্যে। নিরাপত্তা, সুস্থ জীবিকা, জীবনের সুস্থ বিকাশের পরিমণ্ডল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাস্তাঘাট, যানবাহন, আলো, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, আইনকানুন। নির্বাচিত হবার আগে জন-প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতির যে ফিরিস্তি তুলে ধরেন, তাতে বহু ভাল ভাল আশা জাগানোর কথা থাকে। গদিতে আরোহণ করে তাঁরা সব ভুলে যান। তখন দলবাজি ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মানুষ তখন অবাক হয়ে দেখতে থাকে—যে-ই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। স্বজন-পোষণই চলতে থাকে নানা নামে। এইসব দেখে দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে, সব পার্টিই মরণে-অলা পার্টি। দাসখত লিখে দিয়ে যারা ঝাণ্ডা ধরতে পারবে তারাই দিনান্তে পাঁউরুটি আলুর দম পাবে। যারা পারবে না, তারা নির্যাতন সহ্য করবে।

একটা সর্বনাশা ভাবধারা আমাদের রাজনীতিতে প্রথম থেকেই এমনভাবে ঢুকে গেছে যার আর সংশোধন সম্ভব নয়। মানুষ যখন জলে-জঙ্গলে বসবাস করত, ট্রাইব্যাল ছিল, তখন যেমন দল ছিল, দলপতি ছিল, এ-দলে ও-দলে মারামারি হত, এখনও ঠিক সেই অবস্থাই চলছে। তখন লড়াই হত জায়গা-জমি নিয়ে, খাদ্য নিয়ে, নারীর দখল নিয়ে, এখন হয় গদির লড়াই, মতবাদের লড়াই। এক সময় পাদরীরা ধরে ধরে খ্রীশ্চান করত, ইসলাম শাসকরা দেব-দেউল ভেঙে

মসজিদ বানাত, গোমাংস খাইয়ে, মুখে থুতু দিয়ে ধর্মান্তরিত করত। সেই একই ব্যাপার চলছে অন্য নামে। অন্য ভাবে। দলের সমর্থক হতে হবে, না হলে জমির ফসল যাবে। বসতবাটি যাবে। প্রয়োজনে হাসপাতালে অ্যাডমিশান হবে না, ছেলেমেয়ের, নিজের চাকরি জুটবে না। শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ মিলবে না। যার চাকরি আছে তাকে বদলি করা হবে। প্রাণ গেলেও আপত্তি নেই।

দেশ একটা, দল অনেক। মতবাদ হল আইওয়াশ। অর্থনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে যোগ নেই। মতবাদ হল আইডল। ধর্ম আর ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যাদের এত জেহাদ, তারা কিন্তু সযত্নে মত-বাদের একটা অদৃশ্য দেব-প্রতিমা সামনে খাড়া করে মানুষের সহজাত ফ্যানটিসিজমে জিগিরের খোঁচা মেরে চলেছে। আমাদের যে-সব প্রবৃত্তি প্রবল তার মধ্যে হিংসা প্রবল। প্রবল বিদ্বেষভাব। শান্তির চেয়ে লড়াই আমাদের বেশি উত্তেজিত করে। প্রেমের চেয়ে প্রবল হল ঘৃণা। মানুষকে সাইকোলজিক্যালি নাচানো হচ্ছে। প্রতিবেশীকে আমরা বাঙালীরা সহ্য করাত পারি না, বরাবরই আমরা অসামাজিক, স্বার্থপর. অনুদার। আমাদের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার, পদলেহনের, ক্রীতদাসের। স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশেব কুকুর ধরার প্রবণতা আমাদের আজকের নয়। দলাদলিতে আমরা শ্রেষ্ঠ। মাটি দিয়ে পুতুল গড়া সহজ। হাতের চাপে যে কোনও আকৃতি নিতে পারে। নমনীয়। ইস্পাত হলে সহজ হত না। এই জাতীয় চরিত্রকে বিদেশীরা যেভাবে স্লেভ তৈরির কাজে লাগিয়েছিল, স্বদেশীরাও নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সেইভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। ধর্ম্মের নামে হত্যা, নিপীড়নের বদলে মতবাদের নামে তছনছ চলেছে। গেঁয়োযোগী ভিখ্ পায় না এ-দেশে। অমুকে বিলেত ঘুরে এসেছে শুনলে আমরা সসম্ভ্রমে এগিয়ে যাই এখনও। বিলেত ফেরত ডাক্তার, কি সায়েব ডাক্তার কেন, হালুইকর যদি সায়েব হয় আমরা একেবারে গলে যাই। দেশ থেকে দেশের ফসল টুকু ছাড়া আমাদের তখনও কিছু নেবার ছিল না। এখনও কিছু

নেবার নেই। এ দেশের ধর্ম, দর্শন, মহাপুরুষ মত, পথ সব ফেলে দাও। নিয়ে এসো বিদেশী মতবাদ। সেই মতবাদ ভাল করবে কি খারাপ করবে, দেখার দরকার নেই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হল কি না, প্রয়োগ করা যায় কি না, এ-সব প্রশ্ন পরে, প্রয়োজনও নেই। এদেশের মানুষকে এমন একটা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে যে অবস্থায় প্রশ্ন আসে না, আসে আত্মসংলাপ, 'সলিলোকি'। কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না। করবার সাহস হবে না; কারণ পাশেই থাকবে প্রহরী কুকুর। ধর্মগুরুর মতো, রাজনীতির গুরুরা কীর্তন শোনাতে থাকবে, 'ভজো, ভজো, প্রভুর ভজনা করো, আমরা সুদিনের সন্ধানে আছি। গোটা কতক শত্রু খতম করতে পারলেই তোমাদের ধরে এনে দোব'। এ-দেশের মানুষ কি আর চাইবে। দুশো আড়াইশো বছর ইংরেজ বুটের তলায় রেখেছিল। তারপর সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ বছরের স্বাধীনতায় যা হয়েছে তা ইতিহাস লিখবে। কিছু মানুষ, বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষ, স্তাবক, হাত তোলা নয়, ধামাধরা নয় এমন কিছু মানুষ লিখবেন সেই ইতিহাস। 'লুট লে, লুট লে' চলেছে সেই সাতচল্লিশ থেকে। আর একে একে পরিবারের পর পরিবার এসে পড়ছে পথে। ঝুপড়িতে বাড়ছে নব ভারতের জনতা। এই স্তরে থেকে মানুষ কি চাইতে পারে। কি চাইতে হয় জানা আছে কি? সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর ধরে একটি পরিকল্পনাই হয়েছে—মানুষকে কিভাবে আরও গরীব করা যায়। শাসক আর শাসিতের মধ্যে বিশাল একটা ফারাক তৈরি করে রাখতে হবে পরিখার মতো, সহজে লাফিয়ে যেন চলে আসতে না পারে ওরা। নিজের ছেলেকে বলব 'ভালো করে লেখাপড়া কর।' সুযোগ পেলেই তাকে বিদেশ পাঠাব, আর ওদের ছেলেকে বলব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমা মার। এমন হাস্যকর কথাও বলে ফেলব—ছাত্ররাই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবে। ছাত্ররাই পরীক্ষা নেবে। আসলে হচ্ছেও তাই। নির্বাচিত প্রশ্ন তালিকার বাইরে প্রশ্ন এলে পরীক্ষকের জীবন সংশয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে গণ-টোকাটুকি। বাধা দিতে

চাইলেই মৃত্যু।

'ক্লাস' আর 'মাস', দুটো ক্লাসই তো এখন স্পষ্ঠ। সোনার পাথরবাটি গোছের অবস্থা। মাস হল ক্লাসের হাতিয়ার। অমানুষ হবার পুরো স্বাধীনতা দেওয়া আছে। মানুষ হবার স্বাধীনতা নেই। সুযোগও নেই। কিছুই যখন নেই, আর আমাদের জাতীয় চরিত্রের ধরণটাই যখন—গয়ং-গচ্ছ, যা হোক, যেভাবেই হোক দিন কাটিয়ে যাও, আর সংসার বাড়িয়ে যাও, কিছু পাবার আশাও নেই। অ্যামবিশান নেই যে জাতের, সে জাতের 'আমরা বাঙালী' বলে চেঁচানোই সার হবে। তখন পূজা উপাচারের কি মানে হয়! সত্যিই কোনও মানে নেই। দুর্গাপূজোও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিচ্ছে। উস্কানি দিচ্ছে। দুর্গাপূজা কেন ? সব পূজোই হল দলীয় রেষারেষি। ভক্তিটক্তি বাজে। নেতারা সময় সময় বলেন, 'আহা, ওদেরও তো একটা কিছু করা চাই। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। চাকরি নেই বাকরি নেই!'

'এনগেজ' করে রাখতে হবে। ভারি সুন্দর কথা। এই এনগেজ-মেণ্টের অর্থ হল, বোমাবাজি করা। পূজো করা। জোর করে চাঁদা আদায়। মারধোর। দাঙ্গাহাঙ্গামা। খুনখারাপি। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, চোলাইয়ের কারবার, নেশা ভাঙ গাঁজা ছিনতাই। মাস্তানি। কি সুন্দর একটা শ্রেণী বা বর্ণ বেরিয়ে এসেছে—মাস্তান। এরপর ইণ্টেলেকচুয়াল বাঙালী বই লিখবেন—'মাস্তানস অফ দি ওরিয়েণ্ট। বিদেশী প্রকাশক ছাপবেন। বাংলায় অনুবাদ হবে। লেখককে নিয়ে সেমিনার হবে। গবেষকরা গবেষণা করবেন। যেমন নকসালরা মরলেন, প্রাণ দিলেন আর পরবর্তীকালে লেখক প্রকাশক গাড়িবাড়ি করে ফেললেন। কেউ কেউ আবার আমি নকশাল ছিলুম। এতকাল পানাপুকুরে হাড়ি মাথায় দিয়ে আত্ম-গোপন করেছিলুম, এখন আমার আত্মপ্রকাশ। তাকে নিয়ে হইচই। বাঙালী সুতোর ব্যবসা করত সুতানুটীতে, সেই ব্যবসা এখন সবতে। নেপোরা সবসময় রেডি। দই পেলেই হয়।

ধর্মও এখন নেপোদের হাতে। এনগেজ করে রাখা আমাদের ছেলেদের।

বিলিতি বুলির বাংলা, আওয়ার বয়েজ। সবই বুঝি আমরা। দিন দিন দেখছি সব কিছু থেকেই স্পিরিট উড়ে যাচ্ছে। আত্মশূন্য অবস্থা। একে স্পিরিচ্যুয়ালিজমের উল্টো মেটিরিয়ালিজম বলে না। এর নাম সুবিধাবাদিজম। সবার ওপরে নৈবেদ্যের চূড়ায় কলার মত নেপো।

ইডেনে গুঁতোগুঁতি

এপিডেমিক মানে মহামারী। কখনও বসন্ত কলেরা, কখনও ডেঙ্গু, কখনও ফ্লু। কোনও কোনও অসুখের প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকসন বেরিয়েছে। ফুটবল এমন এক এপিডেমিক যার কোনও প্রতিষেধক নেই। অতি সামান্য ব্যাপার। ফাঁকা মাঠ। দু'পাশে দুই গোল পোস্ট। জার্সি পরা দু'দল খেলোয়াড়। গোল মত একটা বল। পায়ে পায়ে বল একবার এ-মাথা থেকে ও-মাথা আবার ও-মাথা থেকে এ-মাথা। গ্যালারিতে রোদে চিংড়ি পোড়া লাখ লাখ দর্শক। চিল চিৎকার করে নেচে-কুঁদে দিনের শেষে প্রায় আধমরা। কারুর আধকপালে, কারুর ফুল-কপালে। রাত-ভোর হতে না হতেই আবার প্রস্তুতি। আবার আসা-সোঁটা নিয়ে পিল-পিল মাঠমুখো।

মাঠের ব্যাপার মাঠে শেষ হলেই বাঁচা যেত। সকালে অন্তত গোটা তিনেক কাগজ দেখা চাই। কোন্ কাগজ কি বলছে। রেফারিদের বিশেষজ্ঞদের মতামত কি? মুখে মুখে ফুটবলের পরিভাষা। বল নিয়ে ওঠা। ইনসাইড ডজ, আউটসাইড ডজ, ফ্লোটার, সুইপার ব্যাক। বিদেশী খেলায় খেলা মাঠেই থাকে, দিশী খেলা সময় সময় মাঠের বাইরে চলে আসে। দর্শকরা খেলতে খেলতে বাড়ি ফেরেন। গাড়ির কাঁচ চুরমার, নিরীহ পথচারীদের মাথায় তবলা বাজানো। চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দেওয়া। পুলিসের সঙ্গে একহাত। ফুটবলের কল্যাণে এখনও ঘোড়সওয়ার পুলিস দেখা যায়। তাদের কাজ হল ফ্যানদের তাড়া করে খানায় ফেলে দেওয়া অথবা ফ্যানেদের তাড়া খেয়ে আস্তাবলে ফিরে আসা।

ফুটবল অতি পুষ্টিকর খেলা। দৌড় আছে, ঠ্যাঙে ঠ্যাঙে বাঁধিয়ে ফেলে দেওয়া আছে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা যেমন বল লাথানো শেখেন তেমনি খুচ্‌ক্‌ করে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে

ধরাশায়ী করা যায় সে কায়দাও রপ্ত করেন। সারা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন দু'ডজন পাওয়ার প্যাক ব্যাটারি। এঁদের হ্যাণ্ডল করতে পারেন একমাত্র দুঁদে রেফরি। তাঁর ঠোঁটে বাঁশি। এ-পকেটে হলুদ কার্ড, ও-পকেটে লাল কার্ড। খুব বাড়াবাড়ি দেখালেই তিনি শেয়াল যেভাবে কুমিরছানা দেখিয়েছিল সেইভাবে কখনও হলুদ, কখনও লাল কার্ড দেখান। মাঠের তিনি হেডপণ্ডিত। বেশি দামালপনা করলেই টাইট দিয়ে ছেড়ে দেন। সময় সময় নিজেও টাইট হয়ে যান। রগচটা খেলোয়াড়, কোচ, অথবা সাপোর্টাররা মার মার করে তেড়ে আসেন। তখন আর লাল, হলুদে সামলানো যায় না। ঢালধারী, লাঠিধারী আদি অকৃত্রিম পুলিস বাহিনীকে নামতে হয় আসরে। কিছু প্রাচীন দাওয়াই ছাড়তে হয়।

ভাষার যেমন ব্যাকরণ আছে। খেলারও তেমনি ব্যাকরণ আছে। খাদ্যের যেমন মশলা আছে খেলার তেমনি পদ্ধতি। মোদ্দা কথা বল গোলে ঢোকাতে হবে। সে চীনে কায়দায় ঢুকতে পারে, লাতিন অ্যামেরিকান কায়দায় ঢুকতে পারে অথবা ইওরোপীয় কায়দায়। সবকায়দা মিলেমিশে অন্তহীন সংকর কায়দাও হতে পারে। কোনও দলের ডিফেন্স ভালো, কোনও দলের অফেন্স ভালো, কোনও দল আবার অফেন্সিভ। নেমেই ঠ্যাঙাঠেঙি।

একালে প্লেয়ার আর চিত্রতারকার প্রায় সমান সমান খাতির। বিদেশী খেলোয়াড়দের বেশ হিরো হিরো দেখতে। ভাষ্যকার অন্তত বারদশেক বলবেন, লম্বে খিলাড়ি, যিস্‌কা লম্বে লম্বে বাল। আবার এও শুনিয়ে দেবেন, এই খেলোয়াড়ের আন্তর্জাতিক বাজারদর দশ হাজার ডলার কি দশ লাখ ডলার। যার পায়ে যেমন কাজ। আচ্ছা ফুট-ওয়ার্ক। অ্যাকসান রিপ্লে মে দেখিয়ে। ফুট-ওয়ার্ক এখন আর শুধু নাচিয়ের পায়ে নেই, দামী ফুটওয়ার্ক ফুটবলারের পায়ে। সে পা আবার ইনসিওর করা পা। এ কি গুরু আমাদের হরিপদদার গোদা পা! বাসের ফুটবোর্ডে যে পায়ে গোটা দুয়েক পা চেপে থাকে! যে পা সারাদিন কলকাতার কোপানো রাস্তা

দুরমুশ করে! যে পা শুধু সংসারের ঘটিবাটিতে কিক লাগায়! এ হল সেই ছিরিরাধিকের পা, কেষ্ট ঠাকুর বলেছিলেন, দেহিপদ-পল্লবমুদারম। এ পা বিকল হলে ঘরে বসে মিলিয়ান ডলার।

কবি বলেছিলেন ওরে! তোরা নতুন কিছু কর। মাঠে ইওরোপিয়ান, ল্যাটিন অ্যামেরিকান, চীন, ভারত মায় সারা ভূ-খণ্ডের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে দেখতে এক ধরনের এক ঘেঁয়েমি এসে যেতে পারে। বড় ব্যাকরণ সম্মত খেলা। বল এর পা থেকে ওর পা, ওর পা থেকে তার পা, সাপের মত এঁকে বেঁকে বিপক্ষের গোলসীমায়। কখনও ডান কোণ, কখনও বাঁ কোণ ফুঁড়ে গোল তাক। প্রায়শই নিশানার ঠিক থাকবে না। বল গোলের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাবে। নব্বই মিনিট ধরে এই চলবে। শ্রম আর পণ্ডশ্রম। এরই মাঝে দুর্লভ একটি গোল হবে। পেশাদার খেলোয়াড়দের ধরন ধারণই আলাদা। যে পক্ষ গোল করলেন, সেই পক্ষ তখন নিজেদের সীমানায় তানানানা করে সময় নষ্ট করবেন। কত কায়দাই যে এইসব ডলার খেকো খেলোয়াড়রা জানেন। এঁরা আবার বড়দরের অভিনেতাও। লাগলো কি লাগলো না, চিৎপাত হয়ে কাটা ছাগলের মত কাতরাতে লাগলেন। টিভির হিন্দি ধারা ভাষ্যকার বড় সুন্দর বলেন, উনে টোকরায়া। আমাদের ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিদেশী কোচের হাতে পড়েছেন, এই সব কায়দা হয়তো রপ্ত করে ফেলবেন। নিজে ফাউল করে নিজেই উল্টে পড়ে ধড়ফড় করতে থাকবেন। দুদলই বিদেশের হলে দর্শকদের জোস একটু কমে যায়। আমরা সাপোর্টার হতে চাই। দু'প্রান্তে দু'দল সাপোর্টার চিল্লে জিতিয়ে দেবার চেষ্টা। দেড় ঘণ্টা ধরে ধুন্ধুমার কাণ্ড। আমরা বুঝি ঘটি বাঙালের খেলা। তার আলাদা এক স্বাদ। যেন ইলিশের কাঁচা ঝাল। অন্য মাছ লাগে না। এত সায়েব নিয়ে আমরা কি করব! ভালো উচ্চমানের খেলা ঠিকই, কিন্তু ভীষণ প্রোফেসানাল। যতটুকু না করলে নয় ঠিক ততটুকুই। তার ওপর নানা সমস্যা। কেউ বরফে খেলেন, ফলে

কলকাতার শীত তাঁদের কাছে সাহারা। দলের বিশ্বমানের খেলোয়াড়টিকে বিপক্ষ এমন জোঁকের মত ধরে থাকেন যে তিনি আর খেলতেই পারেন না। ভাষ্যকারের বিশেষণেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। নামকরা দল সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম আমাদের প্রত্যাশা এমন বাড়িয়ে দেয়, মাঠে আমরা অরণ্যদেব খুঁজি। মনে করি প্রতিটি বলই গাইডেড মিসাইলের মত গোলে ঢুকবে। কখনও মনেই হয় না মানুষে খেলছে। প্রত্যাশা পূর্ণ না হলে বিরক্ত হই। সব সময় মিরাকল খুঁজি। এমন একটা কিছু ঘটবে যা কখনও ঘটেনি।

ভারত খেলোয়াড় তৈরি করতে না পারুক ভালো দর্শক তৈরি করেছে। টিকিটের লাইন মাইলের পর মাইল সর্পিল। অফিসে অফিসে টিভি। একটায় দফ্‌তর খালি। এখানে ওখানে একটি কি দুটি দুর্ভাগা কর্মী টিং টিং করছেন। সকলেই জানেন, একদিন কাজকর্ম বিশেষ হবে না। বাসের লাইনে উৎকণ্ঠিত বেরসিক। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন মাঠ থেকে দেড় লাখ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রায় অচল যানবাহন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ওদিকে ফুটবল, এদিকে রাজনৈতিক মিছিল। ওদিকে গোলের চিৎকার এদিকে মিছিলের স্লোগান। ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। পাতাল রেল পিণ্ডি চটকাচ্ছে। দুই দলে ক্ষমতার লড়াই চলেছে। কখনও সব বন্ধ। কখনও আংশিক বন্ধ। দিল্লি কলকাতায় ফোঁসফোঁসানি। মাঠের ভেতরে দু'দল, লাথাবে ফুটবল। মাঠের বাইরে দু'দল লাথাবে সাধারণ মানুষ। সবই খেলা। কবেকার সেই লাইন, আজও সমান সত্য, এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।

পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি

কোনও বৃদ্ধ যদি প্রশ্ন করেন, 'আজ কি বিয়ের দিন আছে?' তাহলে কি আমরা মনে করব, তিনি এক বিয়ে পাগলা বুড়ো। আবার টোপর মাথায় পিঁড়েতে বসার জন্যে ছটফট করছেন। না, তা নয়। এই কলকাতায় যাঁরা দীর্ঘকাল বসবাস করছেন, তাঁরা জানেন, এই শহরে কত রকমের বাঁশ আছে। বাস একটি বাঁশ। বিয়ের দিন থাকলেই বিকেলের দিকে বাস, মিনিবাস সব উধাও হয়ে যাবে। সাতটার পর একেবারেই অদৃশ্য। প্রতিটি স্টপেজ থই থই। ক্লান্ত অফিসযাত্রী, ক্ষতবিক্ষত ছাত্রছাত্রী, ফ্যালফেলে মুখে আগমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই বুঝি আসে, ওই বুঝি আসে। তিনি আর আসেন না।

ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের পকেটে টাইম টেবল থাকে। শহরের অফিসযাত্রীদের নানারকম টেবল পকেটে অথবা মনে রাখতে হয়। যেমন পঞ্জিকা। বিয়ের দিন আছে কি-না মনে রাখতেই হবে। সেইমত চারটের আগেই পালাতে হবে। যাঁর বিয়ে তাঁর তো কোন সমস্যাই নেই। তিনি ফুলেল গাড়ি চেপে ফুরফুর করে চলবেন। সেদিনের ভি আই পি। বরযাত্রীদেরই বা সমস্যা কি? তাঁরা তো আমাদেরই সমস্যা। তাঁরাই তো আমাদের নড়বড়ে পরিবহন ব্যবস্থাকে একেবারে ফ্ল্যাট করে দেন।

যাঁরা চাকরির খোঁজ করছেন, তাঁদের যেমন প্রতিদিন, মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়তেই হবে, যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদেরও পড়তে হবে প্রাণের দায়ে। খবর তো সেই একই। শ্রীলঙ্কা সাঁতার কাটছে। বিমান ছিনতাই হয়েছে। আগুনে ট্রেন পুড়েছে। ডাকাতে বাস ধরেছে। ক্রিকেটের কোঁদলে ভারত ডিগবাজি

খেয়েছে। হয় এটা, না হয় ওটা। শেয়ালের কুমির ছানা দেখান। যে কারণে কাগজ খোঁজা তা হল, রাজপথে কোন কোন বিক্ষোভ মিছিল বেরোবে। দিবা দ্বিপ্রহরের পর ছোট বড় মিছিল বেরোবেই। বিজ্ঞাপন সংস্থার যেমন বিজ্ঞাপন বের করা কাজ, মিছিল সংস্থার তেমনি মিছিল বের করা কাজ। দাবির শেষ নেই, মিছিলেরও শেষ নেই। অনেকে ইচ্ছে করে মিছিলে যোগ দেন। কার দাবি, কি দাবি, মরগে যা, আমার জানার দরকার নেই। হজমের জন্য আমার হাঁটা দরকার। যে কোনও মিছিলে ঢুকে পড়ি। মিছিলের বেশ একটা ছন্দ আছে, তাল আছে, নির্বিঘ্নে মাইলের পর মাইল হাঁটার সুযোগ আছে। রাতের দিকে চনচনে ক্ষিদে হয়। ঘুমটাও ভালো হয়। তাছাড়া সময়টা বেশ ভালো কেটে যায়।

আবহাওয়ার খবরটাও জানতে হয়। একপশলা বৃষ্টি। প্রথমেই বসে যাবে সরকারী বাস। সরকারী বাসের শরীর ভালো নয়। সর্দি কাশির ধাত। পায়ে জল বসলেই সাতদিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। ট্রামের তো কথাই নেই। সেই কুকুরে কামড়াবার পর থেকেই জলাতঙ্ক। প্রাইভেট আর মিনি সাঁতার কাটার সাধ্যমত চেষ্টা করলেও কয়েক ইঞ্চি বর্ষণেই স্থলপথ জলপথ হয়ে যায়। কিছু কিছু প্রাণী যেমন উভলিঙ্গ হয় এই শহরও তেমনি কখনও ডোবা কখনও ডাঙা। উভচর প্রাণী না হলে চলাফেরার বড়ই অসুবিধে। অনেকেরই আক্ষেপ কেন মানুষ করলে ভগবান। এর চেয়ে ব্যাঙাচি করলে মন্দ হত না। যৌবনে ব্যাঙ। বার্ধক্যে থলথলে কোলা ব্যাঙ। অনায়াস বক্তৃতারও সুবিধে হত। এমন বক্তা জাত তো আর দুটি নেই। তড়াক করে একটা উঁচু জায়গায় লাফিয়ে উঠেই দশগ্যালন বক্তৃতা ঝেড়ে দিল। বন্ধুগণ বলে ধর-তাই, বন্ধুগণের পাংচুয়েশান। কে যে কার বন্ধু। কথায় কথায় ব্লেড চলছে, ক্ষুর চলছে, ছুরি চলছে। এ ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ও একে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

এই এক ঘিনঘিনে পরিবেশে, প্রজাপতি আঁকা চিঠি উড়ে

আসে। শুভলগ্নে কুমার গন্ধর্বের সঙ্গে মধুলীনার প্যাঁপোর পোঁ। ডেবি ডামরি ডেকচি হাত ধরাধরি করে নেমে এল পথে। সেন্ট জর্জরিত সেন্ট চর্চিত মায়ের কোলে শিশুর ঘ্যানঘানানি, মা নেউনতন্ন, মা নেউনতন্ন। কত্তা এমন ড্রেস মেরেছেন মনে হচ্ছে তিনিই আর দুর্গা বলে বসে যাবেন। তেড়েফুঁড়ে হয়তো ঢুকেই গেলেন শুভদৃষ্টির চাদরের তলায়। পিঁড়ে বাহনে ঝুলে থাকা ডাগর মেয়ে চোখ খুলেই চিৎকার করে উঠল। 'অ্যায় তুই আবার কে।'

সরি ম্যাডাম, জ্ঞান ছিল না। নেশার ঘোরে চলে এসেছি। ভেটারেন হাজব্যাণ্ড তো। মার মার। মেরে তাড়া। আবার বরাত ভালো হলে লেগেও যেতে পারে। দোজপক্ষ, দোজপক্ষই সই। যা দিনকাল পড়েছে, পিঁড়েতে পা ঠেকিয়ে ছেলে মেয়ের পিতাকে হয়তো শেষ কাঁচি মারবে, 'অ্যায় যে মশা, নগদ আরও দশ হাজার ছাড়ুন। আমার এজেন্ট মাল গুনে সিটি মারলে তবে পিঁড়েতে চেপে বসব।'

'বেয়াই মশাই ছেলে কি বলে, এমন কথা তো হয়নি। একমাস আগে এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেল।'

বেয়াই ঘোঁত ঘোঁত করে হেসে বললেন, 'খেয়াল করোনি গুরু। লেখা ছিল, সেল্‌সট্যাক্‌স আর সারচার্জ এক্সট্রা।'

আজকালকার আবার পাড়ার 'যুবনেতারা' বরবউকে আটক করে রেখে দেয়। শীতলাতলায় বসিয়ে রেখেছে রাতজাগা দুটি প্রাণীকে। কিছু মাল ছাড় ওস্তাদ। পাড়া খালি করে আমাদের মেয়ে নিয়ে যাচ্ছ। ঘেরাও করে বসে আছে। ওদিকে ছেলের বাপ ছুটছেন মেয়ের বাপের কাছে। 'আরে মশাই হাজারখানেক ছাড়ুন। এমন কথা তো ছিল না। প্যাকিং আর ফরোয়ার্ডিং ইনক্লুসিভ নয়, এক্সক্লুসিভ। টোল ট্যাকস, অকট্রয় ক্লিয়ার করে দিন।'

আজকাল আবার প্রেমের যুগ। প্রেম নেই কৃষ্ণ নেই, রাধা নেই, পেয়ার আছে, মোহব্বত আছে। কে যে কোথায় ফেঁসে বসে আছে। ফাঁস গিয়া দিল। ক্রিকেট সহজে আউট হয় না।

পাত্র পাত্রীর স্তম্ভে লড়ালড়ি করে, সুলক্ষণা, গৃহকর্মে নিপুণার সঙ্গে উচ্চকর্মে রত, ড্রয়িং ফোর ফিগার্সের একটা ব্যবস্থা হল। তারপর শুভদিনে, 'নেমে আয় ব্যাটা, উঠে আয় আসর থেকে। আসলি বাবাজীবন এসসে গেছে। লাস্ট সেভেন ইয়ারস ধরে সাধনা করছে।'

সে যুগ আর নেই। মডার্ন এজ। ম্যারেজ আর অ্যারেঞ্জ করতে হয় না। হয়েই থাকে। তবে নিমন্ত্রণ পত্রের জলুস সাংঘাতিক খুলেছে। কোনওটা পাটে পাটে সাতপাট। কোনওটা রোল করা ম্যাগনাকার্টা। কোনওটা হাত পাখার মতো, চ্যাটালো আর চওড়া। গ্রীষ্মের দুপুরে, লোডশেডিং এর রাতে নেড়ে নেড়ে বাতাস খাও। দাম্পত্য জীবন ওদিকে যতই গরম বাতাস ছাড়ুক আমরা একটু শীতল থাকি এদিকে। মিষ্টান্ন ইতরেজনা তো হয়েইছে। হজমও হয়ে গেছে। বাতাসটুকুই না হয় উপরি পাওনা হোক। এরপর হয়তো এমন দিন আসছে, বাড়ির সামনে টেম্পো এসে দাঁড়াল নিমন্ত্রণকারী সামনে। মুখে বিনীত হাসি। সপরিবারে অবশ্যই আসা চাই। তারপর পথের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, উতারো।'

ভীমভবানীর মত দুটো লোক আসছে, মাথায় আস্ত একটা টিনের চালার মত বস্তু। জিগেস করছে, 'কাঁহা উতারেগা জী'।

'কেয়া বাপ! এ কোন চিজ?'

নিমন্ত্রণকারী বললেন, 'আজ্ঞে নিমন্ত্রণ পত্র। দেয়ালতক খাড়া কর দিজিয়ে। সামালকে, সামালকে। টিউবলাইট। টিউলাইট। হুঁসিয়ারিসে।'

বিয়ের ব্যাপারটা ক্রমশই ট্যাকটিক্যাল ওয়ার ফেয়ার'-এর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। দুপক্ষের দুই মেজর জেনারেলের বুদ্ধির লড়াই আর ক্রমান্বয় দর কষাকষি। পণপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজ হিতৈষী মানুষের কণ্ঠ যতই সোচ্চার হচ্ছে ছেলেদের পক্ষের মেজর জেনারেলদের ততই নতুন নতুন চাল ভাবতে হচ্ছে। যতই হোক চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস এখন তো একেবারে উবে যায় নি। শিক্ষিত মানুষের একটা সমাজ আছে। অসামাজিক কিছু একটা করতে হলে সোজাসুজি করা যাবে না। কায়দা করে করতে হবে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ব্যাপার।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Yon can not choose your father but can choose your father in law. আগেকার দিনে প্রায় প্রকাশ্যেই ছেলেকে নিলামে তোলা হত। শাঁসালো শ্বশুর-মশাইরা এগিয়ে আসতেন। টিপেটাপে, বাজিয়ে বুজিয়ে দেখতেন। অনেকটা বাড়ি কেনার মত। ভিত বেশ পোক্ত, গঠন বেশ ভাল, মালমশলা খারাপ নয়, নোনা ধরবে না, বনেদীজমি, মনে হাওয়াবাতাস খেলে। ইচ্ছে হলে আরও গোটাদুই তলা ওপরে তোলা যায়। আচ্ছা, আমি এই দর দিলুম। দরদস্তুরের পর পিতা পুত্র-স্বত্ব বিকিয়ে দিলেন। তাতে নিজের লাভ না হলেও পুত্রের বরাত ফিরে গেল। শ্বশুরের পয়সায় বিলেত ঘুরে এল। শ্বশুরের ফার্মেই অ্যাটর্নি হয়ে বসল। কি জুনিয়ার হয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করল অথবা বিলিতি ডিগ্রীধারী সার্জেন হয়ে ফোঁড়াই সেলাই আরম্ভ করে দিল। জন্মদাতা পিতা তখন বহুদূরের মানুষ। ছেলে হলেই যে এমনটি হবে তা নয়। ভাল ছেলে হতে হবে। ভাল চাকরির জন্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই, বড়লোক, মানী শ্বশুরের জন্যেও তেমনি নিজস্ব কিছু পুঁজি

থাকা চাই। গ্রেভ মার্কেটেরই নিয়ম। চেন দিয়ে বাঁধা ক্রীতদাসেরা দাঁড়িয়ে। আরব ব্যবসায়ীরা মোহরের তোড়া নিয়ে ঘুরছে। দরদাম করছে। 'এ' ক্লাসের এক দাম, 'বি' ক্লাসের আর এক দাম। গুণানুসারে কেউ যাবে নবাবের হারেমে, কেউ যাবে তেল ব্যবসায়ীর পিপে ঠেলতে। চাইলেই কি আর শ্বশুর পছন্দ করা যায়। তবে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখতে আপত্তি কি?

এখন অবস্থা অন্যরকম। চাহিদা বাড়লে কানা বেগুন, পচা আলুও বাজারে বিকোয়। রঙ করা পটল তিনটাকা কিলো। তিরিশ পয়সায় একটা পাতিলেবু। রসা মাছই চব্বিশটাকা কিলো। ঘরে ঘরে মেয়ে। বাপ মায়ের চোখে ঘুম নেই। পদ্মলোচনরা যে যা পারছে দাম হেঁকে বসছে। অনেকের আবার এই ভাব কিছুই যখন করা যাচ্ছে না তখন একটা বিয়ে করেই দেখা যাক।

ছেলের সংখ্যা কম না হলেও, বিয়ে করে সংসার পাতার মত ছেলের সংখ্যা তেমন বেশী নয়। বিয়ের বাজারে নামতে হলে সাকার হতে হবে। প্রেমের জগৎ বেকারদের হাতে থাকলেও, তাতে হাত মিলিয়ে একটি মেয়েকে ঘরে আনতে হলে খোঁটার জোর থাকা চাই। খোঁটাটি হল জীবিকা। জীবিকার স্তরভেদ আছে, উচ্চ, মধ্য, নিম্ন, অতি নিম্ন।

ছেলে জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হলেই পিতার একটা তুরুপের তাস এসে গেল। আর একটি ক্যাশ সার্টিফিকেট। এইবার একটি বউমা আনতে হবে। অবশ্যই দেখে শুনে। ছেলে বলবে চাকরে মেয়ে হলেই ভাল হয়। দু'জনের রোজগারে গড়গড়িয়ে সংসার চলবে। কত্তার প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হলে গিন্নিরটা খোলা, গিন্নিরটায় ধর্মঘট হলে কত্তারটা খোলা। এতে ট্রেড ইউনিয়ানের শক্তি বাড়বে। তার মানে মেয়ের তরফে আর একটি মাত্রা যুক্ত হল। শিক্ষিতা, সুদর্শনা গৃহকর্মেসুনিপুণা, সঙ্গীতজ্ঞা, নৃত্যপটিয়সী এবং চাকুরিরতা। মানে রম্ভা, তিলোত্তমা, কুন্তি, দ্রৌপদী, গার্গী, মৈত্রেয়ী সব একাধারে ফেলে ঢালাই করা অষ্টধাতুর দেবী।

ছেলের পছন্দ আর ছেলের পক্ষের দাবি, দুয়ে মিলি তৈরি হয় কন্যাপক্ষের বিভীষিকা। দেখাদেখির মধ্যে মেয়ে দেখাটাই দেখা। ছেলে দেখাটা একটা প্রথা মাত্র। নিয়ম রক্ষার ব্যাপার। ছেলের আবার দেখাদেখি কি! চাকরি করে, দুটো হাত পা, একটা মাথ , আর কি চাই! দেখার কি আছে! ছেলে অষ্টাবক্র হোক, মর্কট হোক, সামান্য তোতলা হোক, একটু ট্যারা হোক, মাথায় সামান্য টাক হোক, সব মানিয়ে যায়। ময়ুর ছাড়া কার্তিক পাবেন কোথায়! দেখতে হবে মেয়েকে। ভাল নাক চাই, টানাটানা চোখ চাই, এক আকাশ মেঘের মত কালো চুল চাই, সুরে বাঁধা মিঠে গলা চাই, দুধে আলতা রঙ চাই, গজেন্দ্রগামিনী হওয়া চাই। এর যে কোন একটা কম হওয়া মানেই অন্যদিকে মিটার চড়তে থাকা।

পাত্রের পিতা আরসোলার দাড়া নাড়ার মত হস্তাক্ষরে পোষ্টকার্ড লিখলেন, আপনার মেয়েটিকে আমাদের এক মেটে পছন্দ হয়েছে। এইবার দ্বিতীয় ব্যাচ যাবে, তারপর তৃতীয় ব্যাচে যাবে ছেলে আর ছেলের বন্ধুরা। ছেলের কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। একটু সুন্দরী হলেই সে সন্তুষ্ট। তাছাড়া সে নিজে গান বড় ভালবাসে। সর্বক্ষণই টুস্‌কি মেরে আজকালকার গান গায়। প্রায় গানেরই এক লাইন করে তার জানা। ওরা দেখতে গেলে আপনার মেয়েকে আধুনিক কিছু গাইতে বলবেন, ওই সব মাথানত ফত যেন না গায়। বন্ধু হিসেবেই আপনাকে এই টিপসটুকু দিয়ে রাখলুম। অবশ্য আমরা যা বলব তাই হবে, তবু বোঝেন তো আজকালকার ছেলে। আমরা আর ক'দিন আছি। সারাজীবন যার সঙ্গে ঘর করতে হবে তার যেন কোন খুঁতখুঁতুনি না থাকে। পিতা হিসেবে আমাদের সেটুকু দেখা কর্তব্য।

পাত্রী পছন্দের পর কিঞ্চিত দরাদরি। কথায় বলে, সহস্র কথা খরচ না হলে বিবাহ হয় না। পাত্র পক্ষ খুবই উদার। শিক্ষিতের ফ্যামিলি ত। দাবি কিছু নেই। আমরা চামার নই, বুচার নই! মেয়ের বাপের চামড়ায় ডুগডুগি বাজাতে চাই না। মেয়েটিই

আসল। সম্পর্কটাই বড়। তবে হ্যাঁ পাত্রীর পিতাকে আমরা ছোট করতে চাই না। তিনি যেন হীনমন্যতায় না ভোগেন। বাবা কিছুই দিতে পারলেন না বলে মেয়ে যেন শ্বশুরবাড়ীতে এসে ভয়ে ভয়ে না থাকে। আত্মীয়স্বজনরা যখন বলবে, কি গো ছেলের বিয়ে দিলে একেবারে হাঘরের সঙ্গে। তখন বউমা যেন মরমে না মরে যান। এসব ব্যাপারে জ্ঞাতিগুষ্টির মুখ তো আর বন্ধ করা যাবে না। ছেলের বিয়ে দিয়েছি বলে তাদের মুখে তো আর স্টিকিং প্লাস্টার আটকাতে পারব না। আমাদের কোন দাবি নেই, যা দেবেন সন্তুষ্ট। ছেলেও আমার কিছু চায় না। বাপকো বেটা, সিপাহিকো ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। কিন্তু একটা আছে মশাই। ছেলের বন্ধুরা যখন বলবে, দেখি শ্বশুর ঘড়িটা কেমন দিলে? সোনার বোতামে হীরে আছে কি না? খাটটা খাঁটি সেগুনের পাক্কা সাত বাই সাড়ে সাত কি না? আলমারিটা সেই সেই সায়ের কোম্পানীর মার্কা মারা কি না? ড্রেসিংটেবলটা থ্রি ফোল্ড তো! ওয়ার্ডরোব দেয় নি? একটা টিভি দেওয়া উচিত ছিল। খাটে ছোবড়ার গদি, তুলোর তোশক? সে কি রে? এখন ত সব ফোমের গদি। তখন ছেলের মুখটি যে আমসি হয়ে যাবে। শ্বশুরের গর্বে বুক যদি দশহাতই না হল তা হলে উভয় তরফেরই সম্মান গেল।

আমাদের কোন দাবি নেই। আপনি দিতে চান দেবেন। বাধা দোব না। আপনার ক্ষমতাকে আমরা কখনই ছোট করে দেখবে না। সালঙ্কারে শ্বশুরালয়ে পাঠানই এতকালের প্রথা। সোনা হল একটা মস্তবড় সিকিউরিটি। বিপদে আপদে সংসারী মানুষের মস্ত বড় বল। বেচো, বাঁধা দাও। দুর্দিনের ভরসা। সোনা চিরকাল মেয়ের বাড়ি থেকেই আসে। ছেলে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনতে পারে। ছেলের বাপ সর্বস্বান্ত হয়ে ছেলেমানুষ করতে পারে। কেঁদেককে ঘ্যানঘেনে স্ত্রীর একটা নাকছাবি করিয়ে দিতে পারে। বড়বাজারে গিয়ে ভরি ভরি সোনা কিনতে পারে

না। সোনা আসে। মেয়েরা, মা লক্ষ্মীরা নিয়ে আসে। সোনা হল প্রেসটিজ। আমার এত ভরি। ভাবতেও ভাল লাগে, বলতেও বুক দশ হাত হয়। পাঁচজনে সমীহ করে। প্রতিবেশীর চোখ টাটায়। তাছাড়া আজকাল লকার হয়েছে। ষোল, সতের ভরি যদি নাই দিলেন বউমা কেমন করে লকারে রাখতে যাবেন! ফ্যান, ফোন, ফ্রীজ, লকার হল ষ্ট্যাটাস সিম্বল। বউমা ঠোঁট উল্টে কেমন করে পাশের বাড়ির বউটিকে বলবেন, আমার ভাই সে ভয় নেই, ও লকার করে দিয়েছে, এই হাতের কটা রেখে সব সেফ ডিপজিট ভল্টে ভরে দিয়েছি। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি। সোনাটা আপনি বিশেও তুলতে পারেন। আপনার মেয়েরই থাকবে। মেয়ের যখন মেয়ে হবে তখন আপনার মত আতঙ্কে হার্ট ফেল করতে হবে না। ছেলের বাপের পায়ের তলায় নিলডাউন হয়ে বসে মুখ কাঁচুমাচু করে বলতে হবে না, বড়ই দুঃস্থ, দয়া করে আমার মেয়েটিকে নিন।

এই উদার সমাজে পাত্রপক্ষের কোন দাবি নেই। তবু একটি কন্যাকে ভাল ঘরে পাত্রস্থ করতে পঞ্চাশ হাজারও লাগতে পারে, ষাটেও হয়ত থই পাওয়া যাবে না সান ইন ল-কে সাজিয়ে দিতে হবে। তিনি যেন পরে নিজের কোর্টে পেয়ে কন্যাটিকে তুলো ধোনা না করেন। দেখো বাবাজী! বছর বছর তত্ব পাবে। শীতে স্যুট, কাশ্মিরী শাল, ষষ্টীতে আর এক প্রস্থ। সান না পেলেপ ইন ল পাবে। পেলে না বলে আমার মেয়েটিকে ধামসো না। প্রথমে বাক্যবাণ, পরে অন্তর টিপুনি, তারপর কম্বল ধোলাই, তারপর আড়ং ধোলাই। সব শেষ কেরসিন তেল, দেশালাই কাঠি কিম্বা চ্যাংদোলা করে ওপর থেকে নীচে নিক্ষেপ।

সমাজে প্রগতির জোয়ার এসেছে, শিক্ষার আলো ফেটে পড়ছে। মানুষ আর বনমানুষ নয়। তবে বিবাহ ত একটা দ্রাবিড় প্রথা। মা বললেন, এবার তোর জন্যে একটা দাসী আনতে হবে বাছা। ভদ্র, নিরীহ মেয়েরা সংসারে মুখ বুজে মার খাবে, আর তেমন ডাকা-বুকো জাঁহাবাজরা মার দেবে। যিনি আজকের দজ্জাল শ্বাশুড়ী

তিনিও একদা ঠোনাখাওয়া বউ ছিলেন। অকারণ র‍্যাগিং চলেছে, ঘরে ঘরে। সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যাও করছেন। মানুষ চাঁদে যাবে, আনবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে, লাসার, রাজার কমপিউটারে প্রগতির ইতিহাস লেখা হবে। তবু নারী নির্যাতন বন্ধ হবে না। অথচ নারী ছাড়া সংসার অচল। পুরুষ হার্মাফ্রোডাইট নয়, যে নিজেই নিজেতে সন্তান উৎপাদন করে সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবে! স্ত্রী বিয়োগে নাকে কাঁদবে। ইয়া ছবি বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে মালা পরিয়ে, ধূপ জ্বেলে আজ তুমি নেই, তুমি নেই করবে। অথচ যতদিন সেই দুর্ভাগা জীবিত ছিল ততদিন পরমানন্দে তাকে সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল টর্চার করে মেয়ে-মদ্দ সবাই আনন্দ পেয়েছে। এই বিচিত্র সমাজে কন্যার পিতাদের চোখে তাই ঘুম নেই। ঘরে ঘরে আতঙ্ক মেয়ে বড় হচ্চে। পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার কত হাজারে গিয়ে ঠেকাবে কে জানে। অবশেষে কি হবে? সুখী হবে তো!

জামাইষষ্ঠীর জামাইদের যে যাই বলুন, কেমন যেন বোকা বোকা চেহারা হয়। কেন হয় বলা শক্ত। দেখলেই চেনা যায় মহাশয় শ্বশুরালয়ে চলেছেন? মুখে তেমন হাসি নেই। চোখের দৃষ্টি ক্যালফেলে, উদাস। স্ত্রী চলেছেন আগে আগে। সেজেগুজে। প্রখর রোদে মেকআপ গলে গলে পড়ছে। যেহেতু তিনি বাপের বাড়ি চলেছেন, সেইহেতু চলনে বেশ একটা বাড়তি আবেগ। অনেকটা 'চল্‌রে নওজোয়ানে'র ভঙ্গি যিনি মা হয়েছেন তিনি শাবকটিকে তুলে দিয়েছেন স্বামীর কোলে তোয়ালে জড়িয়ে। নিজের হাতে রেখেছেন প্ল্যাষ্টিকের বালতি ব্যাগ। তার মধ্যে পাট-পাট তোয়ালে। একটি বাড়তি শাড়ি। মাঝারি মাপের সন্দেশের বাক্স। উঁকি মারছে ফিডিং বোতোল। একটি রবার ক্লথের রোলও সময় সময় দেখা যেতে পারে।

ষষ্ঠী আর আগের মত জমে না। জীবন বড় এলোমেলো হয়ে গেছে? মানুষও আজকাল আত্মসচেতন। অনেক জামাই শ্বশুরালয়ের ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলতে পারলে বেঁচে যান। শ্বশুর-বাড়িতে পার্সোনালিটি বড় ধাক্কা খায়। সমীহ করে চলার যুগ চলে গেছে। অথচ স্ত্রীর পিত্রালয়ের গুরুজনদের সামনে ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকতে হয়। নিজের পিতাকে বাবা বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের অভ্যাস খসে গেলেও, স্ত্রীর পিতাকে পিতৃ-সম্বোধনে যথোচিত সম্মান দেখাতেই হবে ; কারণ নিজের টিকিট স্ত্রীর হাতে গচ্ছিত। পান থেকে চুন খসলে বয়কট করে দেবেন। এ যুগে আবার বেয়াইয়ে বেয়াইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠাণ্ডা লড়াই চলে। হয় দেনা-পাওনা নিয়ে। নয় পুত্রবধূর ঔদ্ধত্যের অভিযোগে। দুই পরিবার জল ঘোলা করে দম্পতিকে অশান্তির আবর্তে ডুবিয়ে রাখেন। সম্পর্কের খেলা চলে শ্বশুর জামাইয়ে। ছেলের পিতা-

মাতার সেই এক অভিযোগ, পরের বাড়ির মেয়ে এসে ছেলেটাকে গ্রাস করে নিল। শ্বশুরবাড়ির কথায় ওঠে আর বসে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি তেমন সুখের নয়। তবু ষষ্ঠী আসে। স্ত্রী স্বামী ট্যাকে নেচে নেচে . ষষ্ঠীর টানে পিত্রালয়ে ছোটেন। সেখানে তাঁর অন্যরূপ। যেন বাঁধা গরু ছাড়া পেয়েছে। স্বামীর সংসারে যে মুখ তোলা হাঁড়ি, পিতার সংসারে সে মুখে হাসি আর কলকা-কলির ঝরণা ধারা। তফাৎটা চোখে পড়ে। মন ধাক্কা খায়। আগেকার কালে বিবাহ ছিল জমপেস ওয়েলডিং।

জোড় মেলানো যায় না। বেকায়দায় হাত পড়লে খোঁচা খেতে হয়। দুঃখের হলেও কথাটা সত্যি আজকাল অধিকাংশ ছেলেই স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ির পরিবেশ থেকে আগলে রাখতে চান মগজ ধোলাইয়ের ভয়ে। কে কখন কি ফুসমন্তর ঝেড়ে দেবে, পারিবারিক শান্তি চোট খাবে। বেসুরে বাতাস বইবে।

সুখের ষষ্ঠী, হুল্লোড়ের ষষ্ঠী শহর জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন যেন মনে হয় স্বামী বেচারার গলায় দড়ি বেঁধে স্ত্রী চলেছেন টানতে টানতে। আমার মাতামহের কাছে সে যুগের ষষ্ঠীর গল্প শুনেছি। এখন মেলাতে গেলে আর মেলে না। মাতামহের জীবনের ঘটনা। একবার ষষ্ঠীতে প্রচণ্ড ঝড় জল। কলকাতা ভেসে যাচ্ছে। মাতামহ ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে পঞ্চান্ন ইঞ্চি ধুতির কোঁচা ঝুলিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে পমেটম লাগিয়ে বুরুশ মারছেন। মাতামহের পিতৃদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বৃষ্টিতে যাবে কি করে উত্তরপাড়ায়।' মাতামহ বললেন, সাঁতারে। পিতৃদেব স্ত্রীকে বললেন, 'ব্যাটা আমার বিল্বমঙ্গল।' মাতামহের চোখের সামনে তখন ভাসছে, শহর নয়, বড় বড় তপসে মাছ, মসৃণ ত্বক ল্যাংড়া আম, শুঁড়অলা গলদা চিংড়ি। ভোজনবিলাসী ছিলেন। মনে এক মুখে এক ছিল না। লজ্জাটজ্জার তেমন বালাই ছিল না।

জীবনের অস্বাভাবিক চাপে এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে।

সপরিবারে কোথাও যেতে হলে দুর্ভাবনায় মুখ শুকিয়ে যায়। যানবাহনের শোচনীয় অবস্থা। পয়সা ফেললেও ট্যাকসি মিলবে না। গুঁতোগুতি করে অফিসে যাওয়া যায়, শ্বশুরবাড়ি তো আর কোর্ট কাছারি নয়। স্টপেজে, স্টপেজে, প্ল্যাটফর্মে তীর্থের কাকের মত জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রী ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন। কোন সুদূর শ্বশুরবাড়িতে অন্ন-ঘৃত-পক্ক হচ্ছে। তপসে বাঙালী জীবন থেকে অদৃশ্য। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্মৃতি-সন্ধান করতে হয়। চিংড়ি সহসা চোখে পড়ে না। শাঁখা সিঁদুরের প্রতীক মৎস্য দুর্মূল্য? কার্বাইডে পাকা আম জ্যৈষ্ঠের গরমে আর সে রস ছাড়ে না। যার আকর্ষণে জামাই আসার আগেই ডুমাডুমা নীল মাছি উড়ে আসে।

কারুর কারুর জীবনে ষষ্ঠী বড় করুণ অভিজ্ঞতা। আমার এক বন্ধুর, পঞ্চশালক। শ্বশুর মহাশয় গত হয়েছেন। শ্যালাকরা সকলেই বিবাহিত। শ্বশ্রূমাতা ফ্যামিলি পেনসানে কায়ক্লেশে জীবিত। জামাই বেচারা এখন ভাগের মা। শ্যালকরা স্বার্থপর। তাঁরা বলেন, জামাই হল মায়ের, ষষ্ঠীর আপ্যায়ন করতে হলে তিনিই করুন। আমাদের দায় পড়েছে? বৃদ্ধা তাঁর পেনসানের পয়সায় ষষ্ঠীর আয়োজন করেন! সে বড় করুণ দৃশ্য। শ্যালকরা বউ বগলে সাত সকালেই বাড়ি খালি করে সরে পড়েন। সেই শূন্য বাড়িতে জামাই বেচারা রাতের বেলায় খানকতক ফুলকো লুচি নিয়ে বিরসবদনে বসেন। পরিবেশন আর রন্ধনের দায়িত্ব স্ত্রীকেই নিতে হয়। বৃদ্ধা সারাক্ষণ আঁচলে অশ্রুমোচন করেন। ছেলেদের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করেন। দেয়ালে প্রলম্বিত শ্বশুর মহাশয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আহা আজ ওই মানুষটা বেঁচে থাকলে কি আনন্দের দিনই না হত। তিনি খেতে আর খাওয়াতে ভালবাসতেন।' এদিকে লুচি জুড়িয়ে আসে। এক একটি পদ আসতে থাকে, আর আমার বন্ধু মনে মনে হিসেব করতে থাকেন, বৃদ্ধার সামান্য পেনসানের কত টাকা ধ্বংস হল! বাজারটাই বা কে করেছে। এর নাম চোখের জলের জামাই-ষষ্ঠী।

ষষ্ঠীর রজনী অনেক জামাইয়ের ক্ষেত্রে আবার উপদেশ রজনী হয়ে দাঁড়ায়। সে আর এক জ্বালা! লাল লুঙ্গি আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে বড় শ্যালক ডিভানে আড়কাত। পাশে নস্যির ডিবে আর নস্যির রঙে ছোপানো একটি রুমাল। নস্যিতে ফোঁ টান মেরে বললেন, 'তা, তোমার সেই ব্যাংকিং পরীক্ষার কি হল? ওটা এবার চাড় করে দিয়ে দাও অফিসারস গ্রেডে উঠতে হবে তো!' সামনে চায়ের কাপ ধরে দিতে দিতে স্ত্রীর মাতাঠাকুরানী বললেন, 'শুনেছি তোমার খুব খরচের হাত। বেশ মোটা টাকার একটা ইনসিওরেন্স করে ফেল। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো! শ্বশুর-মশাই সিগারেট পাকাতে পাকাতে বললেন, 'তোমাদের কালে লাখের কমে মেয়ে পার হবে না বাবাজী?'

বড় শ্যালক খেঁই ধরলেন, 'একটা নিজস্ব বাড়ির চেষ্টা কর এখন থেকে। লটারিতে অন্তত একটা সরকারী ফ্ল্যাটই না হয় ছাখো।'

শাশুড়ী বললেন, 'মেয়েটাকে একটা ভালো স্কুলে এখন থেকেই দেবার চেষ্টা করো।'

শ্বশুর মশাই বললেন, 'মানু [মেয়ের নাম] কে একজন স্পেশ্যালিস্ট দেখাও। আফটার ইস্যু কেমন যেন অ্যানিমিক হয়ে যাচ্ছে। জানবে, ষ্টিচ ইস-টাইম সেভস নাইন।'

অনেক শ্বশুর মশাই আবার নিজেকে একটু জাহির করতে ভালবাসেন। 'চিংড়িটা খেয়ে ছাখো। একেবারে এক নম্বর মাল। গোটা আষ্টেক ছিল। চল্লিশের কমে নামল না, আমার আবার একটু উঁচু নজর।'

আমে হাত দিতে গিয়ে হাত টেনে নিতে হল। 'সেরা ল্যাঙড়া। গাছপাকা। দাম একটু বেশি নিলে। তা নিক। খাওয়াতে হলে সেরা জিনিসই খাওয়াতে হয়।'

সন্দেশটি মুখে পোরা মাত্রই বললেন, 'শ্রেফজিভে আর তালুতে পাগলে পাগলে খাও। তারকের নরম পাক। ঘরে কাটানো ছানা। এ জিনিস অর্ডিনারি দোকানে পাবে না।'

এইবার সেইদিন আসছে। নিজের ষষ্ঠী নিজেকেই না করতে হয়। অনেক শ্বশ্রূমাতা আবার চাকুরে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে প্রেসার কুকারে জামাই বাবাজীর ফলার পাকাতে বসবেন ক্লান্ত শরীরে। রাত সাড়ে দশ। তখনও প্রেসার কুকার সিটি মারে না। শোনা গেল তাঁর রাগত কণ্ঠস্বর, 'মুখপোড়াকে, আজ আবার কি রোগে ধরল!'

এর চেয়ে চীনে রেস্তোরাই ভালো। স্ত্রীর তো ষষ্ঠীর উপবাস! নিজেকেই নিজে খাওয়াও। চৌমিনের জট ছাড়াতে ছাড়াতে ভাবো, সামনে বসে আছেন শাশুড়ী মাতা, হাতে তালপাখা নিয়ে। আর কাউন্টারে! অনেকটা তার মতই দেখতে। একটু স্থূলকায়।

'শাঁক ফুঁকে গোল
করলি পোদো'

—কথামৃত

দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় আতঙ্ক বিজয়া দশমী! দশমী বাদ দিয়ে যদি পুজো হত, তাহলে মন্দ হত না। অর্থাৎ মা আসবেন, মা যাবেন না। নবমী পর্যন্ত এসে, মাইকেলের প্রার্থনা। 'যেও না নবমী নিশি, লয়ে তারা দলে,' শুনে মা আমাদের দোলাই হোক, গজই হোক আর নৌকোই হোক, তার বাহক। মাহুত। মাঝিদের ডেকে বলবেন, পুজো কমিটির পাণ্ডাদের খুঁজে বের করে, ভাড়া বুঝে নিয়ে সোজা চলে যাও, আমি আর ফিরছি না। আমার হিমালয়ান কিংডামে গিয়ে বলে দাও, বছরে একবার এসে চারদিন থাকলে, সামলানো যাবে না। এ দেশ আর সে দেশ নেই। কেস সিরিয়াস। লাগাতার মহিষাসুর মারতে হবে, ডেলি অন্তত এক ডজন করে। অসুরের প্রভাব টেরিফিক বেড়ে গেছে। সুরা সেবন করে, জিনস পরে দেশ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় লাগে আমার মহেশ্বরের নন্দী ভৃঙ্গী।

মাতা দুর্গাদেবী এমন সিদ্ধান্ত নিলে, আমরা যারা অসুর, না দেবতা, একত্রে একটি নতুন শব্দ 'নাসুরাদেব,' তারা দু'হাত তুলে নৃত্য করবে আর বলবে, জয় মা, জয় মা। কারণ?

প্রথম কারণ, বিভিন্ন বাহনে মায়ের আগমণ আর গমনে নানা রকম দুর্যোগের সম্ভাবনা। হোক, না হোক মানুষ বড় দুশ্চিন্তায় থাকে। আমরা এক অদ্ভুত জিনিস। আমরা হলুম প্রিমিটিভ মডার্ন মানে। সোনার পাথরবাটি কিম্বা কাঁঠালের আমসত্ত্ব। ঈশ্বর হয়তো মানি না। সাজে পোশকে আহারে বিহারে আচারে আচরণে,অ্যাংলো-অ্যামেরিকান-অস্ট্রাল-হাঙরো-রাশিয়ানো-জার্মান। সিন্নি খাই, শূকর খাই অশৌচ অবস্থায় হবিষ্যি করি, মণ্ডিত মস্তকে চুল না গজাতেই চিকেন রেশমী চালাই। দীক্ষা নিয়ে মালা জপ করি বেবিফুডে ভেজাল মেশাই। শনিবার শনিবার কালীঘাট

কি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মা মা করি। নিজের মাকে শুকিয়ে মারি। যুক্তি দেখাই বিলেতের সভ্য মানুষের ধারায় ওয়াইফ ফার্স্ট, মাদার নেকসট। সূর্য গ্রহণে পৃথিবী উল্টে যাবে ভেবে উত্তেজনায় ছটফট করি। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়ে হরতালের চেহারা নেয়। অষ্টগ্রহ সম্মেলন ঠেকাতে হুমন হয়। আশি মন গব্যপুড়ে যায়। যাঁরা পোড়ান, অর্থানুকূল্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধে তাঁরাই নেন বেশি। স্টিরিও, কালার টিভি, ফ্রিজ, পোলারাইজড ক্যামেরা। চোখে তুলসীপাতা স্পর্শ করিয়ে ভিডিও ক্যাসেটে বিদেশী নগ্ন শরীর দেখেন। স্কচ খান এক চিমটে গঙ্গামাটি ফেলে। রামজী কি জয় বলে বিদেশের মাল চোরা পথে স্বদেশে, স্বদেশের মাল বিদেশে পাচার করেন। হুমনে আশি মন ঘেঁউ পোড়াতে কষ্ট হয় না। বুক ফেটে যায় কর্মচারীদের মাইনে দিতে। দেড়শো টাকায় একজন খেটে চলেছে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা। মানুষ মারো মুনাফা লোটো, তুলসী রামায়ণ পড়ো, জনসেবার প্রতিষ্ঠান করে দেশের দরিদ্রদের ম্যালনিউট্রিসনে দূর করার নামে বিদেশ থেকে সাহায্যের গুঁড়ো দুধ ব্ল্যাকে ঝেড়ে দাও। ফ্লাডের কম্বল ফ্ল্যাটে তুলে দাও। মাছরাতে পার্কস্ট্রিটের বার-এ দুশো টাকা টিপস মেজাজে লে যাও বলে কুকুরের মুখে ডগ বিস্কুটের মত তুলে দাও। আর কারখানায় সেফটিরুলস না মানার জন্যে, না রাখার জন্যে যে শ্রমিকের হাত, কি পা কি চোখ গেল, তার কমপেন-সেসানের টাকা মারার জন্যে ব্যারিষ্টারের পেছনে তিন হাজার টাকা ঢালো। এ দেশে জীবনের দাম সরকারী অ্যাসেসমেণ্ট অনুসারে পাঁচশো টাকা। কি করে বললুম! ট্রেন দুর্ঘটনার পর মৃতের আত্মীয়ের হাতে ওইরকমই একটা অঙ্ক তুলে দেওয়া হয়, পাঁচশো থেকে হাজারের মধ্যে। বিমানে একটু বেশি। মানুষ দেখতে এক, ভোটের হিসেবও মূল্য এক। ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে এক একজনের এক এক রকম দাম। যেন কাপ ডিশ, কাঁচের গেলাস। ফুটপাথে শুয়েছিল, মাঝ রাতে মাতাল

ট্রাক ড্রাইভার পিশে দিয়ে গেল, যেন ব্যাঙ-চেপটে গেছে। নো কমপেনসেসান। ও জীবনের কোনও দাম নেই। স্টাফ্‌ড ম্যান। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত, তাঁর দাম অনেক বেশি। মানুষে মানুষে কত তফাৎ! কেউ 'বোন-চায়না,' কেউ পোর্সিলেন, কেউ ভাঁড়। কারুর ঠোঁটে সোনালী বর্ডার, গায়ে ফুল। কেউ শুধুই কাজ চলা গোছের একটি পাত্র। চায়ের দোকানের নর্দমার সামনে যখন পাঁক তোলে তখন উঠে আসে রাশি রাশি ছুঁড়ে ফেলা ভাঁড়।

মায়ের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত, দশভুজার দশটি হাত যদি সচল হত, তা হলে প্রথমেই শুরু করতেন ভক্ত নিধন। প্রশ্ন করতেন, আমাকে কি তোমরা পুতুল ভেবেছ? রাংতা আর শাটিন জড়িয়ে নিজেদের খুশিমত পোজে চারদিন খাড়া করে রেখে হুল্লোড় হচ্ছে। প্যাণ্ডেলে বাহার দিতে গিয়ে হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। ওদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূতের নৃত্য। সেরা কলেজের প্রাঙ্গণে দারুসেবী অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বেলেল্লাপনা। ছাত্রীদের দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত ছুঁড়ে মারা। ছাত্রদের সাধনা ছেড়ে পারস্পরিক রাজনৈতিক কোঁদল। দলাদলি, হানাহানি। নেতৃস্থানীয়দের জাগ্রত নিদ্রা। দেশের ভবিষ্যত যারা তারা এখন দাবার ছকের বোড়ে। তোমাদের এই পুজো তমসাচ্ছন্ন মানুষের অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন উল্লাস।

খুব বাঁচা আমরা বেঁচে গেছি, মৃন্ময়ী ভাষাহীনা, জড়প্রতিমা। তিনি সবাক হলে প্রশ্ন করতে পারতেন, তোমাদের হাসপাতালে আজকাল চোলাই তৈরি হয়, সেবিকারা ধর্ষিতা হয়, রুগিরা যত্ন পায় না, ওয়ার্ডে কুকুর ঘোরে, মাঝরাতে ইঁদুরে পায়ের আঙুল কুরে কুরে খেয়ে যায়, খাদ্য ওষুধ চোরাপথে বাইরে চলে যায়, স্যালাইন আর গ্লুকোজে ঘোরে মৃত্যুর বীজ। প্রতিকার চাইলে ক্লাস ফোরের দোহাই পাড়া হয়। কেন তোমাদের এই অবস্থা! ধর্মের দেশ। তাইনা। বারো মাসে তেরো পার্বনের স্রোত বইছে। কেন এই পূজো? কার পূজো? শক্তির না তামসিকতার।

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ :

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন্ তুমি দাও যে ফাঁকি॥

দেবী যদি আবার প্রশ্ন করেন, তোমাদের সবই কেন এত হাস্যকর, ছল চাতুরিতে ভরা, সাপও মরে না, লাঠিও ভাঙে না। যেমন পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন। গোটা কতক ব্যানার, চটকদার শ্লোগান, একটি লাউড স্পিকার, উদ্যত হস্ত পথ পুলিশ, কিছু সেবক সেবিকা। সাত দিনের লোক দেখানো, লোক ঠকানো পথ নাটিকা। হুকারদের টেঙিয়ে বিদায়। তারপর আবার পুনর্মূষিক ভব। কুকুরের বাঁকা ন্যাজ আবার বেঁকে যায়। কি বিচিত্র সরলীকরণ পদ্ধতি সাতদিনের তামাশা। এক সপ্তাহ শৃঙ্খলা, একান্ন সপ্তাহ চরম বিশৃঙ্খলা।

সাতদিন, শিশু সপ্তাহের শিশু প্রোটিন মাখানো, সেবা সংস্থার বিস্কুট, পাউরুটি আর গুঁড়ো দুধ গোলা খাবে, আর বাকি তিনশো আটান্ন দিন অর্ধাহারে, অনাহারে থাকবে। কেন? তোমাদের এমন কোন পরিকল্পনা নেই, যাতে সব শিশুই একদিন সুস্থ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে! সকলেই জীবনযাত্রায় একটা সুস্থ মানে পৌঁছতে পারে। স্বাধীনতা তো অনেক বছর ভোগ করলে, তবু দুর্ভোগ তো ঘুচলো না। যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইলে।

দেবী এর উত্তরে আমরা মাথা চুলকোবো আর মাইকের মুখটা তোমার দিকে ঘুরিয়ে দোব।

প্রশ্ন শেষ হয়নি। তোমাদের শহরের সিনেমাহলে স্লাইড পড়ে, শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখুন, পরিষ্কার রাখুন, সুন্দর করে তুলুন। আমি বসে আছি আস্তাকুড়ে। কার দায় পড়েছে, শহর পরিষ্কার রাখার। আমি তো প্রতি বছরেই চারদিনের জন্যে আসি। এসে দেখি আর অবাক হয়ে যাই। তোমাদের একটি পরিকল্পনার বিস্ময়কর অগ্রগতি কাজ না করার আর ভাগাড় বাড়িয়ে চলার। ভাগাড়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বাছা। ওই তো আলোর মালা ঝুলিয়েছ,

টালা থেকে টালিগঞ্জ, শহর যেন ডাইনীর মত দাঁত বের করে হাসছে।

দেবী! এর উত্তর, কিন্তু গোয়ালার গলিকে আমরা ভুলতে চাই না, আমাদের গর্ব। পড়বো আর মেলাবো,

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি
কাছের কান্‌কা
মরা বেড়ালের ছানা
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।

মাতা দুর্গা, তুমি আর প্রশ্ন কোরো না মা। আমরা সব পড়া না করে আসা স্কুলের ছাত্র। কোন প্রশ্নেরই উত্তর জানা নেই। জানি, তুই এবার প্রশ্ন করবে, তোমাদের সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে গেল কেন? সেচ পরিকল্পনায় কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ টাকা খরচ হয়ে গেল, তবু তোমরা খরায় শুকিয়ে মরো, ঝরায় ডুবে মরো। কেন বাছা।

মা পরিকল্পনা যে উঠে গেছে। ঝাঁপে লাঠি পড়ে গেছে। সব জ্যাম তৈরি হয়নি।

তোমাদের ঘরে সন্ধ্যের বাতি জ্বলে না কেন বাছা।

সে তো মা অনেক স্টোরি। মন্ত্রীদের নশ্বরী বক্তৃতার মত। আজ টিউব লিক কাল কয়লা ভিজে, পরশু টিউব লিক, তরশু কয়লা ভিজে। আমরা ঠিক জানি না মা। দুষ্ট সমালোচক বলেন, রাজনীতি। দেশ জুড়ে গদির লড়াই চলেছে মা, তোমার মহিষাসুর মা অনেক নিরীহ প্রাণী। এই গদি অসুর সন্ধি করে গন্ডসুরদের জ্বালায় প্রাণ যায় মা। চামুণ্ডা বাহিনী ছেড়ে দিয়েছে, এ পাড়ায় ও

পাড়ায় বোমাবুমি চলেছে। সারারাত চলেছে মরণের উৎসব। উপদ্রুত এলাকায় পুলিস যেমন চেক-পোস্ট বসায় তুমিও মা তেমনি চেক পোষ্ট বসিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে যাও।

বাছা আমি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করছি, সিমিলি সিমিলিবাস, বিষে বিষে বিষক্ষয়। অসুর দিয়ে অসুর নিধন। বিগ পাওয়াররা কি করছে দেখছ না? ছোটো ছোটো দুটো দেশকে লড়িয়ে দিয়ে, এক পাশে বসে বসে মৃদু মৃদু হাসছে, এটা ওটা সাপ্লাই দিচ্ছে, ধ্বংসের চিতায় ঘৃতাহুতি। সব শেষ হলে আবার শুরু হবে। এখন অসুরে অসুরে আবার ফাটাফাটি চলুক।

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। যুগসন্ধির এই লক্ষণ। স্যাঁতসেঁতে মানুষের দল কি করে চলেছে নিজেরাই জানে না। ঢাউস প্যাণ্ডেলে অপশক্তির বোধন চলেছে। বাসে ট্রামে বাজারে প্রতিদিন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। পরস্পর পরস্পরকে দাঁত খিঁচিয়ে চলেছি। দুই বাঙালীর দেখা মানেই, হয় তৃতীয় আর এক বাঙালীর ছিদ্র অনুসন্ধান, না হয় নিজেদের মধ্যেই টুসটাস। বিজয়ার দিন এঁরাই বেরোবেন নেচে নেচে। দেহের কোলাকুলি হবে, মনের কোলাকুলি হবে না। ও বস্তু বাঙালীর কোষ্ঠিতে লেখা নেই।

তারপর প্লেটে প্লেটে নেমে আসবে সেই আতঙ্ক। কড্ডুল কাটা বনস্পতিতে ভাজা সাংঘাতিক নিমকি গোটা দুই খাওয়ালেই লটকে পড়বে। আসবে ঘুঘনি। যেন আমেরিকার ক্লাস্টার-বম্ব। মটর প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে, অসংখ্য মৃত মাস্তানের চোখের মত। দাঁত বের করে আছে নারকেল কুঁচি। গুঁলো হলুদে, লঙ্কার দাপটে কোনও স্যাম্পল জবা-লাল। কেউ আবার প্রেসারে ছেড়েছেন, গলে পাঁক। কোনওটি ছাটনির মত মিষ্টি, কোনওটি ব্রহ্মতালু ভেদকারী প্রচণ্ড ঝাল, প্রাতঃস্মরণীয়। যাবার বেলায় এ যেন তোমার ঝাড়া লাথি। তুমি থেকে যাও মা।

ঠাকুর দেখার বিপত্তি

ছোটরা বায়না ধরবেই। ঠাকুর দেখতে চলো। ব্লেডের ঠাকুর। ছোবড়ার ঠাকুর। জলের ঠাকুর। অদৃশ্য ঠাকুর। ডিস্কো ঠাকুর। বিস্কুটের প্যাণ্ডেলে চায়ের ঠাকুর। ঠাকুর দেখার আগে, ত্যাখো প্যাণ্ডেলের বাহার। অজন্তা, ইলোরা, সোমনাথ, মীনাক্ষী, মসলিপুরম, ল্যাঙ্কাস্টার হাউস, হোয়াইট হাউস, সাঁসেলিজা, শোলাপুর। ডেকরেটররা আজকাল ভেলকি দেখাতে পারেন। ত্নটো বাড়ির মাঝখানে সামান্য ফাঁক ছিল। উঠে গেল বাঁশের, চটের, চ্যাটাইয়ের কারিকুরিতে তিনতলা বাড়ি। চোখ টেরা। ময়-দানবের খেলা। আসল, নকল বোঝা দায়। বৈঠকখানায় মা বসেছেন আসর সজিয়ে। সরস্বতী সেতার বাজাচ্ছেন, লক্ষী টাকা গুনছেন, কার্তিক যেন পুরানো কলকাতার বাবু। অস্থর ডনবৈঠক মারছেন।

ঠাকুর দেখার দায়িত্ব ক্রমশই বাড়ছে। প্রথমে ত্যাখো আলো। চন্দননগরের মাথা বটে। আলোর হাতি বল খেলছে। আলোর গিন্নি ঝাঁটা মারছে। আলোর বেড়াল ইঁত্নর ধরছে। আলোর ভক্ত বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর ছুটছে। সারা শহর জুড়ে আলোর কেলেঙ্কারি। মাথার ওপর আলোর মালা। ধরধর করে আলো ছুটছে। আলোর চোরপুলিশ। আলোর পরে প্যাণ্ডেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে ত্যাখো। পারলে পড়ে নাও বিবরণ। কোন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের অনুকরণ। এইবার গিজি গিজি ভিজি ভিজি ভিড়ে নিজেকে ফেলে দাও। ভিড়ই ঠেলতে ঠেলতে এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওই দিক দিয়ে বের করে দেবে। লাউড স্পিকারে ঘনঘন ঘোষণা, পকেট সামলে, ঘড়ি সামলে, হার সামলে, ত্নল সামলে। এরই মাঝে হারিয়ে যাবার ধুম পড়ে যাবে। ছিড়িক গান, আকাশবাণীর কায়দায় ভারি গলার ঘোষণা—উল্টোডাঙ্গার মধুমতী, তোমাকে

তোমার জগা খুঁজছে। যেখানেই থাকো আমাদের এনকোয়ারির সামনে চলে এসো। গান, প্রভু আরও আলো, আরও আলও। হাওড়ার বক্রেশ্বরবাবু, আপনাকে আপনার স্ত্রী ভামিনী দেবী গরু খোঁজা খুঁজছেন। এইসব শুনতে শুনতে, শুনতে শুনতে, গোঁত্তা খেতে খেতে, মা দুর্গে, অসুরনাশিনী মা, আর যে পারি না।

ছোটদের হাত ধরে বেরোতেই হবে। না বেরলে চাকরি যাবে দাদুর। সংসারের দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে। বউমা বলবে, যান না বাবা, বসে না থেকে, বাচ্চাটাকে একটু ঠাকুর দেখিয়ে আনুন না। বৃদ্ধ চললেন। ছেলে ষাট টাকা দামের একটি তাঁতের ধুতি দিয়েছে। খাদি থেকে কেনা রিডাকসানের পাঞ্জাবি। চোখে ছানি কাটা চশমা। সে এক করুণ দৃশ্য। মধুরও বটে। শিশুর অসংখ্য প্রশ্ন। দাদু অসুর কেন উল্টে আছে? উত্তর, মা দুর্গা উল্টে দিয়েছেন। প্রশ্ন, কখন সোজা করবেন? উত্তর কৈলাসে গিয়ে। প্রশ্ন, অসুর কেন সিংহকে মারছে না? সিংহ কেন অসুরকে খাচ্ছে না? উত্তর, ক্ষিদে নেই দাদু। অসুরের মা নেই? প্রশ্নে প্রশ্নে দাদু অস্থির।

বউকে নিয়ে স্বামী না বেরোলে স্বামীর চাকরি যাবে। কার্তিকের তীর তো ছোঁড়াই হল না। আজীবন হাতেই ধরা রইল। মা তো একাই একশো। দশটা হাতে দশ রকমের অস্ত্র। বাহন আবার সিংহ। যুদ্ধটা যদিও খুবই সেকেলে। পারমাণবিক যুগে অচল। মায়ের হাতে কবে যে স্টেনগান ধরানো হবে। অসুরের হাতে ক্ষুর আর বোতল বোমা! কে জানে! তা স্ত্রীর বাক্যবাণ বড় সাংঘাতিক। হৃদয় ঝাজরা করে দেয়। 'বচ্ছরকার এই তিনটি দিন বাড়িতে বসে হেসেল ঠেলো। এমন জীবনের মুখে ঝাড়ু মারি।'

'ঠাকুর কী দেখবে? দেখার কী আছেটা! সেই তো এক পোজ, এক ধুনুচি-নৃত্য। মাইকের খ্যারোর খ্যারোর। কোদলানো রাস্তা, ভ্যাড়-ভ্যাড়ে কাদা, গ্যাদগ্যাদে লোক। ভালোও লাগে? ছ্যাখার না থাক ছ্যাখাবার তো থাকে। ইনস্টলমেণ্টে এত শাড়ি কেনা হয়েছে। আলমারিতে লাট খাবে। নতুন নতুন শাড়ি পরে

মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছেন। উমাদিনীর মতো হকের পল্লী থেকে ছুটছেন বিরাশির পল্লীতে। পথের মাঝে কেউ কেউ থেমে পড়ে শাড়ির ভাঁজ ঠিক করছেন। নিচু হয়ে তলার দিক থেকে টেনে টেনে ঝুলের গরমিল মনোমত করছেন। অন্যের শাড়ি দেখে স্বামীকে ফিসফিস করে বলছেন, 'ছ্যাখো ছ্যাখো তানচৈ বেনারসী। তোমার জন্যে কেনা হল না টেররিফিক।'

স্বামী শাড়ি দেখতে গিয়ে মনে মনে গেয়ে উঠলেন, 'চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি।' আবার যাঁদের সত্ত একটি হয়েছে তাঁদের মহাজ্বালা, লক্ষণের শ্রীফল ধরার মতো, ধরে ধরে পেছন পেছন ঘুরে বেড়াও। 'লতু, গোটা সতেরো তো হল। টেংরি খুলে যাবার যোগাড়। এইবার চল না, প্যাভেলিয়ানে ফেরা যাক।' 'না, সেঞ্চুরি না করে আমি ফিরবো না।'

ইচ্ছের ঠাকুর দেখা আর অনিচ্ছার ঠাকুর দেখা, দুইয়ে মিলে পুজোর কটা দিন জমবে ভাল। বয়সে যারা তরুণ তারা প্রাণের টানে পথে নেমে আসবে। মা তো উপলক্ষ্য। আসল লক্ষ্য, এমন দিন বছরে একবারই আসে মা তারা। ললিতা, বিশাখা, সিল্ক, জর্জেট, শিফন, নাইলন। হাইহিল, ফ্ল্যাট হিল। দিশি, বিলিতি সুগন্ধ। কলকাতার নরকে স্বর্গের ব্র্যাঞ্চ এরই মাঝে, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে, টইটম্বুর ফুচকা, অসীম কায়দায়, সামনে ঝুঁকে শাড়ি বাঁচিয়ে মুখে ঠেলা। অষ্ট সখী ঘিরে ধরেছে ফুচকা শিল্পীকে। তার গায়ে আজ নতুন জামা উঠেছে। কাঁধের গামছাটিও নতুন। পাশ দিয়ে চলেছে কুচকাওয়াজ। ছেলে, বুড়ো, যুবক, তরুণী পিলপিলিয়ে চলেছে। মাইকে মাইকে শব্দব্রহ্ম। কোনওটায় বম্বের হিট হিরো হিট ফিল্মের ডায়ালগ ছাড়ছে, মহব্বত, ইনসান, মওত, কুত্তে, সরাফৎ হকিকৎ, হাম, তুম, আজা, লড়কন, ধড়কন শব্দের জগাখিচুড়ি কানের ভেতর দিয়ে মর্মস্পর্শ করছে। বাঞ্ছারামের গলিতে স্যাঁতানো ঘরে পড়ে আছে প্রত্যহের সংসার। খাটের ওপর বেরোবার আগে শ্রীমতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন বাড়িতে পরার শাড়ি। চেয়ারের

পেছনে ঝুলছে প্রত্যেহের পাজামা। মেঝেতে হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে আছে প্রসাধনের পাউডার। চিরুনি থেকে চুল ছাড়ানো হয়নি। টিপের পাতা মোড়া হয়নি। ড্রয়ারের ডালা বন্ধ হয়নি। পাখার স্যুইচ অফ করা হয়নি।

আলো, শব্দ, গান, আনন্দের জোয়ার বইছে। ছোটখাটো সমস্যারও শেষ নেই। জোজোর নতুন জুতো ফোস্কা উপহার দিয়েছে। সে আর হাঁটতে পারছে না। জুতো এখন বগলে। জুলির হাই হিলের একটা হিল খুলে পড়ে গেছে। বউদির শাড়ির আঁচল বাঁশের পেরেক আটকে ফালা। দাদা এক রাউণ্ড ঝেড়ে, পাণ্টা ঝাড় খেয়ে পাশে পাশে এমন গোবদা মুখে চলেছে যেন বড়-লোকের বাড়ির দারোয়ান ভজন সিং। লিলির পেছনে ডনজুয়ান লেগে গেছে। যে প্যাণ্ডেলে যাচ্ছে, সেই প্যাণ্ডেলেই পেছন পেছন। মাকে বলছে, 'ও মা, ওই ছ্যাখো, মুখপোড়াটা এখানেও এসেছে।' মা বলছেন, 'তাকাসনি। তাকিয়ে মরছ কেন?' এরই মাঝে দু চারটে মারামারির সাক্ষী হতে হবে। সেই এক সমস্যা, হয় নারী না হয় পকেটমার।

আজকাল আবার ঠাকুর দেখার হোল নাইট হয়েছে। ইট-খোলার লরি ভাড়া করে রাত এগারোটা নাগাদ পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়ো। লরিতে একপাল ছেলেমেয়ে। কোনও কোনও রক্ষনশীল বাড়ির মেয়ের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে কোলের ভাইটিকে পাউডার টাউডার মাখিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'আমরা বাবা মেয়েকে কোথাও একলা ছাড়ি না।' সঙ্গে সাক্ষীগোপাল। এক লরি ছেলে মেয়ে চিৎকারে দশ দিক কম্পিত করে ছুটলো টালা থেকে টালিগঞ্জ। হোল নাইটের জন্যে অষ্টমী আর নবমীই হল দিন। নবমী হলে মহা মজা। সকালে ফিরে এসে বিছানায় লেটকে পড়ো। বিজয়ার বাজার থেকে দায়মুক্ত। স্ত্রী বললেন স্বামীকে, 'যাও তুমিই নিয়ে এস, বোঁদেটা একটু শুকনো এনো। ঘুগনির মটোর একটা একটা করে দেখে নিও, বড় পোকা থাকে। নারকোলটা

বাজিয়ে নিও। রসগোল্লা টিপে নিও। দালদা নিও নিও গাছ মার্কা। খোকাকে আর ডাকব না। সারা রাত জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উৎসবের দিনে, কিছু কিছু ছাড়পত্র পাওয়া যায়। কেউ কেউ ঢুক করে সামান্য হুইস্কি মেরে চোখ ঈষৎ আরক্ত করে একটু তদন্তে বেরোন। 'আহা! মা কি সেজেছেন।' 'কোন মা? তোমার চোখ তো ভাই প্রতিমের দিকে নেই!' 'আরে ভাই, যে মা ঘটে, সেই মা-ই তো পটে। আমি জ্যান্তো, দ্বিভুজা দুর্গা দেখছি। মা কি সেজেছেন। টাঙ্গাইলের খোলে সুঠাম দেহছন্দ। শ্যাম্পু করা চুল, পিঠে আলুলায়িত। অসুর আমি এ পাশে মূর্ছিত। আসছে বছর আবার এসো মা।'

শিশু না হলে এই মহাপূজার মহানন্দ পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। আমরা যারা অর্থনীতির দাস, জীবিকার জন্যে কোথাও না কোথাও মাথা বিকিয়ে বসে আছি, তারা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব করবে না, 'মা তুমি এলে' বলে আনন্দে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করবে, নতুন জামাকাপড় পরে। কী যে করা যায়। প্রতি বছর এ এক মহা অশান্তি। 'সংসারী মানুষের সঞ্চয় করা উচিত' —এই উপদেশ শুনতে শুনতে কান পচে গেল। উত্তম উপদেশ ; কিন্তু এই বাজারে সঞ্চয় হয় কী করে। এক মহাপুরুষ বলেছিলেন, 'খ্যাখো বৎস, জীবনে তিনটি কাজ কখনও করবে না, এক, মুদিখানার খাতা রাখবে না। দুই, ভাজা জিনিসে আসক্তি না এনে, সেদ্ধ জিনিস খাবার প্রবণতা বাড়াবে। তিন, ঠিক কত টাকা তুমি রোজগার কর নিজের স্ত্রীকে কদাচ জানাবে না।' তিনটি নিষেধই এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। প্রতি মাসেই মুদিখানার খাতা দেখে স্প্রিংয়ের পুতুলের মত লাফিয়ে উঠি। প্রতিজ্ঞা করি দেনা শোধ করে খাতা পুড়িয়ে দেবো। সে আর হয় না। আবার মাথা বাড়িয়ে দি মুড়িয়ে দেবার জন্যে। একটি সত্য হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, ধার কখনও শোধ করা যায় না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। জন্মেই নিতে আরম্ভ করেছি, বন্ধ করার উপায় নেই। একবার যখন টেনেছি তখন টানা-ছাড়া করতে করতে শেষ ছাড়া ছাড়তে হবে শেষের দিনে। এ মাসের টাকা শোধ করার পর নগদে কেনার মত টাকা থাকে না।

যবে থেকে চাকরি-জীবন শুরু হয়েছে তবে থেকেই শুরু হয়েছে ভাজা। খাচ্ছি ভাজা। হচ্ছি ভাজা ভাজা। ডাল, ভাত, আলুভাজা কোনও রকমে মেরে দিয়ে, ছোটো বাস কী ট্রেনের পেছনে। তা ছাড়া আমাদের মত মধ্যবিত্তের প্রাণের বন্ধু হল

অম্বল। পেটে ঢুকে আলুভাজা রেপ-সীড অয়েল ছড়াতে শুরু করল মৃদুমন্দ। অফিস, হাজিরা খাতা, লাল দাগ, তিন দাগে এক সি এল, গুঁতোগুতি ধ্বস্তাধ্বস্তি, চেয়ারে বসেই পয়লা কাপ চা, পেট ফুলে ঢোল, প্রথামত টিফিনে ঝালমুড়ি অথবা ভে-চপ কিম্বা ক্ষয়া ক্ষয়া লুচি। রাত দশটা অবধি শান্তি। সকালের আহারে একখণ্ড পাঁপড় ঢোকাতে পারলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। সিগারেটের অভ্যাস থাকলে সোনায় সোহাগা। রাতে এক জোড়া অ্যান্টাসিড ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। ঝট করে আলসারটা কালচার করে ফেলতে পারলেই ইন্টেলেকচ্যুয়াল। কপালের তুপাশে সরে যাওয়া চুল, মাঝে কাঁচাপাকার বাহার। চালসে ধরা চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে খুঁতখুঁতে সমালোচনা। জাতে ওঠার এই জাতীয় সড়ক।

মানুষ যখন তু'মহল বাড়ির অধিবাসী ছিল, বারমহল আর আর অন্দরমহল, তখন স্ত্রীজাতি থেকে দূরে থাকার অসুবিধে ছিলো না। একালের ফ্ল্যাটে তা সম্ভব নয়। চোখ এড়িয়ে সিনেমা-পত্রিকা দেখারই উপায় নেই, তো আয় গোপন করা। খুব পাকা চোর না হলে নিজের আয় থেকে কিছু চুরি করা যায় না। একালের স্ত্রীরা হলেন শার্লক হোমসের স্ত্রী সংস্করণ। দৃষ্টি ঘ্রান উভয়ই তুরন্ত। বিচারবুদ্ধিও প্রবল। কী তোমার চাকরি, বেসিক ডিএ, এইচ আর এ সব মুখস্থ। পালাবার পথ নেই পাঁচু। তাছাড়া স্ত্রীরা আমাদের অর্ধাঙ্গিনী নন, আমরাই তেনাদের অর্ধাঙ্গ। হাতে হাল ধরিয়ে তুশ্চিন্তার পাল তুলে বসে থাক। বেশি টেঁণ্ডাই মেণ্ডাই করেছ কি মরেছ। হালে পানি পাবে না। স্ত্রীরা আমাদের দয়া করে পোষেন বলেই বেঁচে আছি, তা না হলে কবে রস মরে বীরখণ্ডি হয়ে মায়ের ভোগে চলে যেতে হত। কেরোসিন তেল, র‍্যাশান, ইলেকট্রিক বিল, স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, মাইনে দেওয়া, রুমাল জামার বোতামের খবর রাখা, কোথায় 'সেল' দিচ্ছে সন্ধান রেখে দাঁও মারতে ছোটা। ইলেকট্রিক লাইন মেরামতের জন্য মিস্ত্রী ধরা, ছাদে

জল পড়ছে, আলকাতরা মাখানো চট পাতা। দেবী দশভূজা। অসুরের বুকে বাক্যবাণের খোঁচাটি বজায় রেখে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমাদের পজিশান আর পোজ ঠিক আছে। অ্যাকসান নেই। বধ হয়েছি, মরিনি। ওদিকে মুদি আর এদিকে স্ত্রী মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দিলে। নিজেদের বিকিয়ে বসে আছি।

শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের ছবি, দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের বাদ্যি চোখেও পড়ে না, কানেও ঢোকে না। দুবার হাঁচলে বুঝতে পারি ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। বেমক্কা কেনাকাটা শুরু হলে বুঝতে পারি এসে গেল পূজো। দেবার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই। রঙিন একটি জামা পরে শিশু হাসছে। নতুন জুতো জোড়া বালিশের পাশে রেখে কিশোর ঘুমোতে যাচ্ছে। পেছন থেকে বালা পরা কচি কচি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে শিশুকন্যা আবদার করছে, এক শিশি কুমকুম। প্রিয়জন শাড়ির আঁচলা মেলে ধরে হাসি হাসি মুখে বলছে, বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে। তার যে কী আনন্দ। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানো এক জিনিস। তোমরা সবাই হাস, তোমাদের সঙ্গে আমিও হাসি।

প্রবাসী দাদা এই সময়ে সপরিবারে আসবেন। দাদা পিতার সমান। ভাইঝিটা ভারি সুন্দর হয়েছে। বছরে একবারই দেখা হয়। ছিল এতটুকু। দেখতে দেখতে মহিলা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মুখে অমলিন হাসি। ধীর স্থির মৃদুভাষী। লেখাপড়ায় কৃতী। বাবা নিজে পছন্দ করে বউদিকে এনেছিলেন। তাঁর পছন্দের তারিফ করতে হয়। প্রবাসী বলেই বাঙলার পুজোর এত টান। রোজ অঞ্জলি দিতে পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে ছুটবে। স্নান-পবিত্র মূর্তি। ফিরে আসবে কপালে এতখানি একটা সিঁদুরের টিপ নিয়ে। তখন মনে হবে দেবী তুমি প্যাণ্ডেলে অনড় প্রতিমা, না গৃহে সচলা। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগে যাবে রান্নাঘরে। কত রকমের রান্নাই যে জানে। খুশির রান্না আর কর্তব্যের রান্নায় অনেক পার্থক্য। দিন দশেকের জন্যে

যৌথ পরিবারের প্রাচীন সুখ ফিরে আসবে। বাবার কথা, মায়ের কথা, ছোট বোনটার কথা মনে পড়বে। তাঁরা ছিলেন, ছিন্নভিন্ন আমাদের রেখে চলে গেছেন। দাদর বাজারের শখ। রোজ সকালে আমার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরবে। ধোপ দুরস্ত পাঞ্জাবি পরে। যেতে যেতে পুরনো মানুষদের খবর নেবে। তাঁরা কোথায় আছেন। কেউ নেই। নতুন নতুন সব বাড়ি উঠেছে। নতুন জীবন। যা কিছু পুরনো, ধীরে ধীরে সব হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন বসতবাড়ির হাতবদল হচ্ছে। নতুন ধনী মানুষেরা নতুন মূল্যবোধের পতাকা ওড়াচ্ছে। স্বজাতি হয়েও তারা যেন বিজাতি। তাঁদের চলন-বলন, ভাব-ভাবনা, আমোদ-প্রমোদ সবই ভিন্ন ধরনের।

বাজারে নতুন ফুলকপি উঠেছে। কচিপালং। নতুন মূলো। মাছের বাজারে অতিপ্রাচুর্য নেই। পুরনো আমলের, শান্ত মেজাজের বেপারিরা নেই। রাগী ছোকরারা বসে আছে। তারা হাসে না। কথা কম বলে। মাঝে মাঝে ধমকায়।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতেই শীতের মুখের ছোট বেলা শেষ হয়ে আসবে। দিনান্তের ক্লান্ত পাখি অলস ডানা ঝাড়বে। বারান্দার ইজি চেয়ারে দাদা পুজোসংখ্যা খুলে বসবেন। জিজ্ঞেস করবেন, বল কার লেখাটা আগে ধরব। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসবে ঢাকের শব্দ। মাইকের গান। ভাইঝি একপাশে দাঁড়িয়ে চুল শুকোবে। বউদি আসবে পান চিবোতে চিবোতে। তখন একটি কথাই মনে আসবে, মা আমাদের জন্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনেন। আনেন ক্ষণ-মিলন সুখ।

পুজো সংখ্যা কোলের ওপর খোলাই পড়ে থাকে। অতীতের কথা হতে থাকে। মা কী রকম ঘুগনি করতেন। কে সবার আগে বিজয়া করতে আসত। লক্ষ্মীপুজোর চন্দ্রপুলী। তালের ফোঁপল কাটা কী কষ্টকর। সিদ্ধি খেয়ে আমরা একবার কী করেছিলাম। দশমীর দিন আমাদের কুকুরটা মারা গিয়েছিল। বউদি বসে থাকবে পা মুড়ে। দেখতে দেখতে সূর্য নেমে অসবে আরও নিচে। দাদার

মুখের বাঁ পাশে নিস্তেজ রোদের রেখা পড়বে। উত্তর থেকে বয়ে আসবে শীত শীত বাতাস। দূর আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে, ঝাঁক ঝাঁক সাদা পাখির মত শীত আসছে পাহাড়ের আশ্রয় থেকে উড়ে উড়ে। আকাশ প্রদীপ আকাশ ছোঁবে। দীপাবলীর মালা পরবে শহর। দুর্গা হবেন শ্যামা। ত্বকে শীতের টান ধরবে। জল ঢাললে গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করবে। রোদ হয়ে উঠবে কমলালেবুর মত মিষ্টি। দিনের আলো নিবে গেলে দীপমালায় সেজে উঠবে শহর। তারার আকাশে এক ফালি কুমড়োর মত লেগে থাকবে সপ্তমীর চাঁদ। মেয়েদের সাজগোজ শুরু হবে। এই কটা দিন মনেই হবে না আমরা হা-অন্ন নিরন্নের দেশে বাস করছি। চারপাশে রং শুধু রং। দুঃখের মুখে সুখের প্রলেপ।

ঝগড়াঝাঁটি, মামলা-মকর্দমা সবই আপাতত স্থগিত। র‍্যাশানের দোকানের সামনে বিশাল লাইন, কেরসিনের জন্যে টিনবাস্ক সবই মনে হবে মধুর। ঢালাও উৎসবে সব তিক্ততাই সহনীয় হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে শোনা যাবে, রবীন্দ্র সংগীত, হিন্দি ফিল্মি গান আর ঢাকের বাদ্যি। যত রাত বাড়বে, তত লোক বাড়বে পথে। জঞ্জাল, আবর্জনা, খানাখন্দ যেমন আছে যেভাবে আছে থাক পড়ে। পায়ে পায়ে শুধু চলা। নতুন জুতো ফোস্কা ফেলেছে, সেও আনন্দের। রাজনীতির থাবা আপাতত শিথিল, বিদ্যুতের মুষ্টিভিক্ষা এই কটি দিনের জন্যে ধনবানের দানসাগর। তামসিক নিদ্রা চোখের আসন ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। ভাঙা চোরা সব মুখই আলোয় উজ্জ্বল। মণ্ডপে মণ্ডপে মাটির প্রতিমা সত্যিই জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। দুটি চোখে তাঁর বিদ্যুৎ। পদতলে অসুর প্রকৃতই কাতর। এই আনন্দের দিনেও শ্মশান কিন্তু খালি যাবে না। মৃত্যুর ছুটি নেই। চিতায় উঠবে এক বধূ অথবা কোনও এক শিশু। জীবনের শেষ পুজোর শেষ পোশাকটি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে অগ্নিসমর্পণে। কান্নারও আর সে জোর নেই। দুঃখও তরল হয়ে গেছে। নাতির হাত ধরে বৃদ্ধ এসেছেন প্রতিমা দর্শনে মনে মনে ভাবছেন, সামনের

যার আর কী দর্শন হবে। নাতির প্রশ্নবানে জর্জরিত। থাকার আবেগে না থাকার শূণ্যতা ভরে উঠছে। মৃত্যুর সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে শিশু ভোলানাথের কথা। সব দৃষ্টিই মায়ের দিকে। এদিকে কারুর দৃষ্টি থাকলে, জীবনের তিল তিল পরিণতি স্পষ্ট হত। আজ শিশু কালে সে-ই পরিণত বিদায়ী বৃদ্ধ। এক রাশ ঝরা ফুলের মত পায়ের তলায় পড়ে আছে জীবনের ঝরা দিন।

এই শহরেরই একপ্রান্তে আছেন আমারই এক বৃদ্ধা আত্মীয়া। সাবেককালের নোনাধরা বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন। এককালে কী বোলবোলাই না ছিল। রূপও ছিল তেমনি। জুড়িগাড়ি চেপে গঙ্গাস্নানে যেতেন। রোজ সকালে আস্ত একটি রুইমাছ পড়ে থাকত রান্নাঘরের রকে। সে মাছের আকার আকৃতি দেখে বেড়ালও থমকে থাকত ভয়ে দূরে। পরিবারের বড় আদরের বধূ ছিলেন তিনি। আভিজাত্য আছে। অর্থ নেই। প্রিয়জনেরা বিদায় নিয়েছেন একে একে। স্মৃতি আছে ছবি হয়ে। কণ্ঠস্বর নেই। পিছনে ফেরে নিজেরই পদশব্দ, বিশ্বস্ত সঙ্গীর মত। বড় আনন্দে রেখেছিলেন বৃদ্ধার স্বামী। নিত্য নতুন শাড়ি পরাতেন। প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াবে এ ঘরে ও ঘরে! বেনারস থেকে জর্দা আনিয়ে দিতেন। কথা বললেই সুন্দর গন্ধ। সেই বাড়ির সব ঘরে এখন আর আলো জ্বলে না, আঁচলের আড়ালে সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে বৃদ্ধা ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। নিজেরই ছায়া কাঁপতে থাকে দীর্ঘ হয়ে দেয়ালে। দুই সন্তান বিয়ের পর বউ নিয়ে আলাদা। মাসে মাসে কিছু মাসোহারা পাঠায়। একালে কর্তব্যের নতুন ব্যাখ্যা এই হয়েছে! সেই বৃদ্ধার কাছে ইঞ্চিপাড় একটি শাড়ি আর এক বাক্স মিষ্টি হাতে পূজোর আগে যাওয়া এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিঃসঙ্গতা, দুঃখ তাঁকে ম্লান করতে পারেনি। কারুর প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই। জীবনে সুখের মাত্রা এত বেশি ছিল দুঃখকে দুঃখ বলে মনে হবার আগেই জীবন শেষ হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার মুখে তাঁর বাড়িতে যাব। ধ্যানস্থ প্রাচীন বাড়ি।

কার্নিসে বটের ঝুরি ঝুলছে। নোনা লেগে খসে পড়েছে দেয়ালের পলেস্তারা। মৃদু করাঘাতেই প্রাচীন কপাট উন্মুক্ত হবে। সচল প্রস্তর মূর্তির মত সামনেই সেই বৃদ্ধা। চোখে রূপোর ডাঁটির চশমা। মুখে প্রসন্ন হাসি। জীবিত কোনও মানুষকে দেখার কী আনন্দ। মধ্যবিত্তের কায়ক্লেশ উপার্জনে কেনা সামান্য একটি কাপড়, এক বাক্স মিষ্টি, এমন কোনও মূল্যবান উপহার সামগ্রী নয়, মন দিতে চায় অনেক কিছু, সামর্থ্যে কুলোয় না। তারপর এও ভাবি টাকার অঙ্কে সব আবেগ কি প্রকাশ করা যায়। সমস্ত প্রয়োজনের উর্ধ্বে যিনি চলে গেছেন তাঁর কাছে উপহারের বিচার মূল্যে নয়। সাগ্রহে হাত পেতে নেবেন তিনি। ভাব দেখাবেন খুশি হয়েছেন তিনি। সে শুধু আমার লজ্জা ঢাকার জন্যে। স্নেহ আর আশীর্বাদ ছাড়া আমাকে তাঁর দেবার কিছু নেই। জীবনে বহুমূল্য দুটি জিনিস। অর্থে যা কেনা যায় না। ফিরে আসার সময় চকিতে মনে হবে, সামনের বার আর কি দেখা হবে।

দেখতে দেখতে দাদার ছুটির দিন শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে বাঁধা-ছাঁদা যেখানে যা ছড়ানো ছেটানো ছিল একে একে সবই উঠে যাবে। দাদা, বউদি, ভাইঝি তিনজনের চোখই ছলছল করবে। গাড়িটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। শেষ বাঁক নেবার আগে পর্যন্ত তারা ফিরে ফিরে তাকাবে। বাড়ি একেবারে ফাঁকা। এত ফাঁকা যে চড়াইয়ের কিচকিচ ডাক শোনা যাবে।

হাট ভাঙা সংসারের শূন্য বিছনায় মাঝরাতে শুয়ে মনের চোখে দেখব, বন-পাহাড়ের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে ট্রেন চলেছে, দূর থেকে দূরে। এ ট্রেন বছরে একবার আসে, একবার যায়। দুপ্রান্তে দুটি স্টেশান। এ-প্রান্তের স্টেশানের নাম প্রিয়জন, ও প্রান্তের নাম প্রয়োজন।

কেন জানি না, এই পুজো এলেই মনের আকাশে অতীত উঁকি মেরে যায়। এ মনে হয়, নীল আকাশের ষড়যন্ত্র, প্যাঁজা তুলোর মত মেঘের ষড়যন্ত্র, উষার শীতল বাতাসের কেরামতি, ভোরের ফোঁটা শিশিরে ফিরে তাকানো। ঝরা শিউলির স্মৃতিচারণ। কেন যে এমন হয় আমার জানা নেই। পোড় খাওয়া প্রৌঢ়ের শরীর থেকে একটি কিশোর বেরিয়ে এসে অতীতের দিকে হাঁটতে থাকে। কতদূরে সে চলে যায়! প্রায় চল্লিশ বছর পেছনে।

তখন যে আমি কর্তা ছিলুম না। জীবনে তখন সুখ ছিল কত। মন সবে ফুটছে। স্বপ্নে, কল্পনায়। পৃথিবীর যত নোংরামি, দাসত্ব সব দূরে পড়ে আছে। রাজনীতি কাকে বলে জানি না, অর্থনীতি তাও বুঝি না। কেরিয়ার কি বস্তু, খবর রাখি না। তেল দিলে কি হয়, তেল না দিলে কি হয়, আমার অজানা। কিশোরের চোখে সবই সুন্দর! সবুজ শ্যামল। ছোটো ছোটো পাওয়া।

যে যে-জীবন থেকে ওঠে সেই জীবনের জন্য তার ভীষণ একটি আকুতি থাকে। সব মানুষই দিনের শেষে ঘরে ফিরতে চায়। যে জীবন হারিয়ে গেছে, স্মৃতি হয়ে গেছে, শরতের নীল আকাশ বেয়ে ঢাকের শব্দে ক্ষণিকের জন্যে ফিরে আসে। জীবন নৌকোর হালটি তখন ক্লান্ত, অলস হাত থেকে খুলে পড়ে যায়। যাত্রী হয়ে ভাসতে থাকি দুঃসময়ের জলাশয়ে।

মা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। যেমন আসেন তেমনি আসেন প্রতিবছর। কোনও পরিবর্তন নেই। আমি-ই কেবল পালটে গেছি। দিনে দিনে আমার মনে হচ্ছে। বিশ্বাসের জগৎ ছেড়ে অবিশ্বাসের জগতে প্রবেশ করেছি। আমার সমস্ত পূজা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মা আমার কাছে শক্তিহীন পুতুল মাত্র। বিচিত্র অঙ্গসজ্জায় প্রাণহীন মৃন্ময়ী। প্রাণপ্রতিষ্টার সাধ্য আমার হয়নি।

শক্তির পূজারী হিসেবে আমার যা চেহারা হওয়া উচিত ছি‹ আমার তা হয়নি। অপসৃত কৈশোর বিপর্যস্ত যৌবন মাড়িয়ে, দিকভ্রষ্ট প্রৌঢ়ত্বে এসে অহরহ বলছে—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। নিজের দোষেই দরকচা মেরে গেছি।

সকলকে নিয়ে যে বাঁচতে শেখেনি, তার বেঁচে থাকায় সব থাকতে পারে সুখ থাকে না। সব তফাৎ যাও, তফাৎ যাও করতে করতে জীবন পল্লবশূন্য। এ ডালে বসে পাখি আর গান গাইতে আসে না। কাকের কর্কশ চিৎকারে কান ফাটে, প্রাণ ভরে না। এমন আমার দেবী আরাধনা, মা আমাকে পূর্ণতার বদলে শূন্যতা দিলেন। লক্ষ্মী বিরূপ, সরস্বতী বীতরাগ, কুলঙ্গিতে ওলটানো গণেশ। চতুর্দিকে নেংটি ইঁদুরের নাচানাচি। সিংহ-বিক্রম দিনের প্যাঁচা। কোটরে বসে লাল চোখ ঘোরাচ্ছে।

বেশ ভালই হয়েছে। শাপগ্রস্ত সাধক। শিব হতে গিয়ে বাঁদর হয়ে গেছি। এখন সাধনার জোরে ন্যাজটিই বহরে বেড়ে চলেছে। বাঁদরামিরও শেষ নেই। মা আসেন, আর হাসেন। মনে মনে বলেন—কি হয়েছিস খোকা? শৈশবে তোকে দেখেছিলুম বাঙালির—বাচ্চা। ভাসা ভাসা নিষ্পাপ দুটি চোখ। বর্ষার জলে ভরা শরতের জলাশয়ের পাশে নেচে নেচে ফড়িং ধরছিস। সোনার চামচ মুখে ধনীর ব্যাটা ছিলিস না; কিন্তু জীবনে বেশ একটা সুখ ছিল। তখন তোকে দেখার জন্যে মাথার ওপর কত আত্মীয়-স্বজন ছিল। জ্যাঠাইমা, কাকীমা, পিসীমা, দাদা, বউদি। চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর গড়ার সময় হাঁ করে যে কিশোরটি দাঁড়িয়ে থাকত সে কি তুই?

হ্যাঁ, মা আমিই সেই। শৈশব আমার শান্তি নিয়ে সরে পড়েছে। নির্ভরতার সব আশ্রয় স্বার্থপরতায় নছনছ হয়ে গেছে। চণ্ডীমণ্ডপের ওপর দিয়ে চলে গেছে জাতীয় সড়ক। সাপলা ভাসা, নীল আকাশের রঙচোঁয়ানো শরতের জলাশয়ে ধাপার আবর্জনা ঠেসে মানুষের জন্যে পায়রার খুপরি তৈরি হয়েছে। দিকে দিকে গৃহ-

স্বামীর আস্ফালন, ভাড়াটের চিৎকার। জলের কলে বালতি ধরে টানাটানি। মানুষে মানুষে কাজিয়া। মহিষাসুরের হামাগুড়ি। ঝ্যাঁটা, জুতো, লাথিতে প্রেমের আদানপ্রদান। পরিবার ভেঙে গেছে, সমাজ অসলগ্ন, সব প্রতিষ্ঠান চুরমার। প্রকৃতির শিশির মাখা শীতল বাতাস ভোরের শয্যায় মাথার সামনে এসে বসে না, ঘুম-কাতুরে উঠে বসো, দ্যাখো ষষ্ঠীর সকালে শরৎ কেমন সেজেছে? সরস্বতী নদীতে নাও সাজানো হয়েছে, সদাগর যাবেন সাতসাগরের পারে বানিজ্যে। রাজা যাবেন মৃগয়ায়। পায়রার খোপে রাতের পাখা ঘুরছে ড্রাগনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফুঁসে।

কোথায় গেল আমার সেই শৈশবের শিউলী লোটানো সকাল। শিশির ভেজা দুর্বা। দোয়েলের নাচানাচি। কোদলানো ফুটপথের ওপর দিয়ে আমার সকাল চলেছে টপকে টপকে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে। লো প্রেসারের সকালে কর্মপ্রবাহ এনেছে এক কাপ পানসে চা। লাইনের সকাল শুরু হল। দুধের লাইন, রেশানের লাইন, বাসের লাইন, ব্যাঙ্কের লাইন, ইলেকট্রিকের লাইন। লাইনটানা জীবন। কোথাও একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে।

সংগ্রাম যেখানে চলছে চলবে সেখানে আবার উৎসব কিসের! এ তো আমাদের অস্ত্র শানানোর যুগ। দেব দানবের সংগ্রাম, না দানবে দানবে সংগ্রাম, কে বলবে! সবই কি মায়ের ইচ্ছা, না দানবের ইচ্ছা! আধুনিক প্রতিমা কি তাহলে উলটে যাবে! মায়ের জায়গায় অসুর, অসুরের জায়গায় মা! স্থান পরিবর্তন। পায়ের জিনিস মাথায়, মাথার জিনিস পায়ে। পাদুকার দাম অবশ্য খুবই বেড়েছে। ইঙ্গিত পূর্ণ বুদ্ধি। মাথার চেয়েও মনে হয় দামী। নরমুণ্ডের ইদানীং তেমন দাম নেই। যে হারে গেণ্ডুয়া খেলা হচ্ছে। এক কোপে সাবাড়। সাবড়ে দেবার পর সোজা মর্গে, সেখান থেকে সংকার। ছবি ছেপে তল্লাস চলে। অনেক জল ঘোলা করে আত্মীয়-স্বজন ফিরে পায় হয় একটি হাতঘড়ি, না হয় পরিত্যক্ত পরিধেয়, অথবা একটা মাদুলি।

যে মঞ্চে মা আসেন, তার চারপাশে ভক্তজন বড় বিমর্ষ। কি

হবে জানা নেই। কখন কি হবে তার কোনও পূর্বাভাস নেই। আজ আছি, কাল নাই-এর যুগে মায়ের ভূমিকা দর্শকের। অস্ত্র, কৃপাণে মরচে ধরে গেছে। বিশ্বকর্মা যে কল চালিয়ে ধার দিয়ে দেবেন, সে উপায়ও নেই। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি, ইউনিয়ন বাজি, কল বিকল করে দিয়েছে। মা লক্ষী বাঙালীকে ঘৃণা করেন। মা সরস্বতী সিলেবাসের গোলে পড়ে বিদ্যালয় ছাড়া। ছাত্রে ছাত্রে লাঠালাঠি। বিদ্যার চেয়ে মহাবিদ্যার দিকেই একালের ঝোঁক বেশি। গণেশ ঠাকুর এখন গদিলোভী। ইঁদুরে সব ফসল খেয়ে গেল। রেশনে ডিউশ্লিপ। প্যাঁচা এখন গট-আপ গেম খেলছে। ইঁদুরে ঘুষ দিয়ে লিগ জিতছে।

সার্বজনীন-অলারা মাকে ধরে আনে, তাই তিনি আসেন, ভাঙা, গলাপচা শহরে আলোর গোড়ের মালা দেখতে, হিটহিন্দি গান শুনতে নিজের ইচ্ছেয় আর আসেন না। আগমনী গান গাইবার শিল্পী কোথায়। সবাই তো ডিসকো-ড্যানসার! সংসারের ডিসকোতে সারাদিন নেচে কুঁদে অস্থির। সন্ধ্যায় আরক্ত চোখে ক্ষতস্থান লেহন। প্যাণ্ডেলে বসে মা আমার উর্দ্ধনেত্র। ভেবেই পান না, মায়ের পূজো, না প্যাণ্ডেলের পূজো, না আলোর পূজো। ফুকো দেওয়া দুধের মত, ফুকো দেওয়া জোলো উল্লাসে, বাঙালীর কষ্টার্জিত কয়েক কোটি, প্রতিবছরই ফুকে যায়। চাঁদা এখন ট্যাকসের মত। বছর বছর দিতেই হবে আর চার রাত জেগে কাটাতে হবে।

চ্যাল বে আর হ্যাটবে-র যুগে বারোয়ারী মায়ের চেহারা খ্যামটা-উলির মত। পাগলামিরও শেষ নেই—পেরেকের প্রতিমা, আলপিনের প্রতিমা, নাট-বল্টুর প্রতিমা। তাইতেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। বিল্বপত্র নিক্ষেপ।

আমার পিতার শিশুটির মগজ ধোলাই হয়নি। তার শৈশবকে কেউ হত্যা করতে পারেনি। সেকালের শিশু শিশুই ছিল। একালের মত বুড়িয়ে যায়নি। আমার শিশুটির কিন্তু শৈশব নেই। তার কল্পনার জগৎ আমরা ছোট করে দিয়েছি। সে ড্যাংগুলি খেলে না। ঘুড়ি ওড়ায় না, ভোরে উঠে ঝরা শিউলী কুড়োয় না। ঘাসের

ডগায় শিশিরের নাকছাবি দেখে না। তার জন্যে সবুজ কোনও মাঠ নেই; বাতাবি লেবুর ফুটবল নেই। বর্ষার নালাতে সে কাগজের নৌকো ভাসাতে ছোটে না। তিনতলার কোনও দম আটকানো খুপরিতে তার ঘুম ভাঙে। এক চিলতে বৃক্ষহীন আকাশ করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। তার জন্যে আছে—ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ডাঁই ডাঁই বই, সদাজাগ্রত মাতার সায়েব বানানোর তিরস্কার। আছে ঘড়ি ধরা সময়ে পরিচ্ছন্ন ব্রেকফাস্ট, প্রোটিন সমৃদ্ধ মধ্যাহ্নের আহার আর আছে উইক-এণ্ড ও টার্মিনাল পরীক্ষার আতঙ্ক। সিলেবাসের ভারে নুয়ে পড়ে সে এগিয়ে চলেছে কেরিয়ারের দিকে। তার জীবনে শরৎ নেই, বসন্তের কোকিল নেই, পূজোও নেই। আছে কালচারড সভ্যতার বিকৃত আনন্দ। আমার নিজের শৈশবের মৃত্তিকাগন্ধী সেই আনন্দ, সেই সরলতা তাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না।

সেকালে মানুষ মানুষের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেত। একালে তার ছাড়পত্র সাজানো বৈঠকখানা পর্যন্ত। দেঁতো হাসি, প্রাণহীন ভদ্রতা। বিজয়ার আলিঙ্গনে সেকালের উষ্ণতা নেই। পূজোর আগেই বাঙালী এখন বাইরে হাওয়া খেতে চলে যায়। শুনতে হয়, এই ন্যাস্টি শহর, ন্যাস্টি পূজো, হই হট্টগোল, ডিসগাস্টিং। এ কেমন আবাহন।

বর্ণাশ্রম ভেঙে ফেললেও অর্থাশ্রম ঠিকই বেঁচে আছে। মানুষের পরিচয় মানবিকতায় নয়, উপার্জনের অঙ্কে বাঁধা। সেই কতকাল আগে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙাল নিধিরামে লিখেছিলেন—মশায়ের ব্যাতোন। কলেরায় আক্রান্ত নিধিরাম পড়ে আছে গঙ্গার ধারে। তিন ব্রাহ্মণ স্নানে এসেছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে, মশায়ের নাম? নিবাস? শেষে মশায়ের ব্যাতোন কত? বেতনের অঙ্কের ওপর নির্ভর করছে নিধিরামকে সাহায্য করা হবে কি হবে না! বিজয়ার পরের দিন অফিসে অফিসে কোলাকুলির ধরণ দেখলে সেই কথাই মনে পড়ে। ব্রাহ্মণ, শূদ্রে ভেদাভেদ না থাকলেও, হাজারী, দু'হাজারী, তিন হাজারী মনসবদারের বিভাগে মানুষ আড়ষ্ট।

পাঁচশো টাকার চাক্‌রে আর দু'হাজার টাকার চাক্‌রেতে কোলাকুলি চলেছে—পাঁচশো টাকা, ডানাকাটা পেঙ্গুইনের মত সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, ভেবেই পাচ্ছেন না, কাঁধে না কোমরে না পিঠের দিকে হাত রাখবেন। মাঝের বাতাসে স্পর্শ বাঁচিয়ে বুকের ডাইনে বামে অর্ধ মোড়ে। একে বলে হাফকোলাকুলি।

যে দেশে পাড়ায় পাড়ায় বোমবাজি, মানুষ বিচ্ছিন্ন, বিব্রত, বিস্রস্ত, বিভেদ যেখানে রাজনীতির, অর্থনীতির, যে দেশে বেঙ্গলী আর ইংলিশ মিডিয়ামের কাটাকাটি, লাঠালাঠি, ঝুটোপুটি, যে দেশের রাত ভয়াবহ, দিন মিছিলাকীর্ণ, সে দেশে মাতৃসাধনা একটী প্রথামাত্র। কিছু দেওয়া, কিছু নেওয়া, কিছু দেনা, কিছু পাওনা। গানের ঝরনা, বিসর্জনের বায়না, সামান্য বোনাস, আকাশছোঁয়া দাম। মন গেলে মানুষের আর কি রইল! কোথায় সেই হাসি, কোথায় সেইসব দিলখোলা মানুষ! প্রকৃতির পীড়ন মানুষকে যেমন সহ্য করতে হয় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝটিকা, ঠিক সেই ভাবেই চোখ কান বুজিয়েই পার করে দিতে হয় বারো মাসের তের পার্বণ। দেবীকে কি বলব, কিভাবে আসতে বলব : যা দেবী বঙ্গভূতেষু

স্যানেটারি ইনস্‌পেকট্রেস রূপেণ
সংস্থিতা ॥
যা দেবী বঙ্গভূতেষু
পুলিশাধ্যক্ষ রূপেন সংস্থিতা ॥
যা দেবী বঙ্গভূতেষু
সংবিধায়ক রূপেন সংস্থিতা ॥

কি ভাবে আসবে মা! একাধারে এসো।

হরি দিন তো গেল

বছর নতুন, চিন্তা সেই পুরনো

খেড়ে হয়ে গেলে জীবনের আনন্দ কমে যায়। দরকচা মেরে যায় জীবন। বোকা বোকা মুখ চোখ। মাথাটা যেন পাটের ঝুলঝাড়ু। হয় সামনের দিকে না হয় পেছন দিকে এক খামচা চুল। মনে সবসময় ভেলিগুড়ের বস্তার গায়ে দুপুরের বোলতা উড়ছে ভোঁ ভোঁ! হলুদ সব দুশ্চিন্তা। দিন আসে দিন যায়। মাস পয়লায় গোনা মাইনে। তিন চার তারিখে যৎকিঞ্চিৎ বাকি দিন মনের ইচ্ছেয় লালাম জুতে, হ্যাট ঘোড়া, হ্যাট। মাল্টি ভিট খেয়ে আর কত এনার্জি আনা যায়। রঙকরা শুকনো পটল। শিল্পী আবার একটা একটা করে ডোরা টেনেছে গায়ে। ঢ্যাঁড়সে সবুজের পোঁচ। ভয় দেখাচ্ছে—চিনি হবে, চিনি হবে। বাজারের পাশে ফেলে রাখা মাছের চাকা চাকা আঁশের দিকে বিরহীর মতো তাকিয়ে থাকা। 'মনে হল—সিনেমায় কায়দায় ফ্ল্যাশব্যাক—সেজ মামার সোনারপুরের বিশাল পুকুর। বাঁশ ঝাড়, আমবাগান। দোল খাচ্ছে লিচু। সিঁদুরে রঙের জাঁদরেল মাছ উঠেছে পীতুর ছিপে। বাঁশতলায় পড়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে। গাছের ডালে সতৃষ্ণ নয়নে বসে আছে দুটো কাক। রোদের গুঁড়ো উড়ছে বাতাসে। সিধু ভট্চাজ কলুপাড়ায় পুজো করতে যাচ্ছেন। কানে গোঁজা কাঠ চাঁপা ফুল। শালগ্রামের সিংহাসন। সামনে ঝুঁকে মাটির দিকে দৃষ্টি ফেলে হনহন হাঁটা। বোধহয় সাত বাড়ি ঘুরতে হবে। মাছ দেখে থমকে গেছেন। হাতে শালগ্রাম। কথা বলা নিষেধ। চোখ কথা বলছে। চাকা চাকা মাছ। ভাজা, ঝাল, ঝোল। মাথাটা চলে গেছে মুগের ডালে। মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে পীতু আবার ছিপ ফেলেছে। ফড়িং উড়ছে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। গাছের পাতা ঝুপড়ি ডাল জল ছুঁয়ে আছে। খাঁজে খাঁজে শীতল ছায়া। সেই ছায়া দোলা জলে স্নানে নেমেছে হংস

পরিবার। হাঁসেরা সব রেগে রেগে কথা বলে। মাঝে মাঝে এমন প্যাঁক প্যাঁক করছে ঈশ্বরও ভয় পেয়ে যাবেন। আলুর পুতুলের মত ভেসে ভেসে চলেছে।

শহর জীবনটাকে শেষ করে দিলে। অন্ধ করে দিলে। বধির করে দিলে। কত রকমের নীচতা। কদর্যতা। এক সময় জাতিভেদ আমাদের জ্বালিয়ে মেরেছে। ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ভেদাভেদ তেমন নেই হযতো, কিন্তু আর এক যন্ত্রনায় আমরা জ্বলছি। নতুন ধরণের বর্ণভেদ। তুমি কংগ্রেস, আমি কম্যুনিষ্ট, আমি এস এস পি। নাও মুখ দেখাদেখি বন্ধ। পাড়ায় পাড়ায় চৌহদ্দি ভাগ। এ যেন সেই পুরনো জমিদারী প্রথা! এই এতটা 'সাত-আনি'র এলাকা। ওই অতটা 'দশ আনি'র এলাকা। এদিক থেকে ভুলে ওদিকে, ওদিক থেকে ভুলে এদিকে এলে জবাই কোপাই। ভাবতে খারাপ লাগে, আবার না ভেবেও উপায় নেই, কুকুরের জগতে এই ব্যাপার আছে এলাকা পেরোলেই খেযোখেয়ি।

তারপর আর এক উৎপাত, সমস্ত মানুষকেই অকারণে মারমুখী করে তোলা হচ্ছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার? পরস্পর পরস্পরের প্রতি কেন এত বিদ্বেষভাবাপন্ন। পারলে এ ওকে কাটে, ও একে কাটে। কিন্তু 'ইস্যু'টা জানা নেই। পারিবারিক সদ্ভাব অনেককাল শেষ হয়ে গেছে। সামাজিক সদ্ভাব, মেলামেশা, সে আপদও শেষ করে দিয়েছে আমাদের রক্তজবা রাজনীতি। নিরীহ শান্তিপ্রিয়, অতিথিবৎসল বাঙালী আজ ঠ্যাঙাড়ে। ভাবলে দুঃখের হাসিতে মুখ বিকৃত হয়। সংগ্রাম। বিপ্লব। নানা বুলির কচকচানি। আরে! সংগ্রাম তো হওয়া উচিত দারিদ্রের সঙ্গে, কুসংস্কারের সঙ্গে, দুর্নীতির সঙ্গে, বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান করাপশানে চুর হয়ে আছে। কেউ কাউকে সাহায্য করে না, 'স্কুইজ' করে। চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। একটা কাজও সহজ নয়। দয়ামায়া সব উধাও। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবা টাকা আদায় করতে গেছে, সহানুভূতি দূরে থাক, মুখে কংসের হাসি। টাকা

ছাড় তবে ফাইল নড়বে। ন্যায্য পাওনা। ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেবে। বৃদ্ধ শিক্ষক ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতলা খইয়ে, আজ আসুন, কাল আসুন শুনে, শুনে, শেষে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটির আশা ছেড়েই দেন। তাহলে এ কার সংগ্রাম। কিসের সঙ্গে সংগ্রাম জোতদারে শুষছে। অস্বীকার করছি না। শিল্পের মালিক? হ্যাঁ তিনিও শুষছেন। কিন্তু জনসেবকরা যে চুষে চুষে সব ছিবড়ে করে দিলে।

রাজনীতি থাকুক! রাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে। গণতন্ত্রে মানুষ অবশ্যই রাজনীতি সচেতন হবে। হওয়া উচিতও; তা বলে দেশ ভেসে যাবে! কোথাও কোনও উন্নতি নেই। আবার কি অদ্ভুত 'নেগেটিভ' কথাবার্তা! যেমন আরও অবনতি হতে পারত। এর চেয়েও অবনত দেশ আছে। এত খুন কেন? আরও খুন হতে পারত। হয়নি তোর বাপের ভাগ্য। বায়রণের দর্শন। তুমি কী দুঃখে আছ। তোমার কি কষ্ট। তাকিয়ে ছাখো তোমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে আরও কত জন! সেইটাই তোমার সান্ত্বনা। পৃথিবীর কটা দেশ যুক্তিতে চলে!

ঘোলাটে সমাজ। বিষণ্ণ পরিবার, বিঘ্নিত নিরাপত্তা, ঘিনঘিনে জীবন। মানুষের দেহ আর মনের জেল্লা ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে। প্রকৃতিকেও প্রায় শেষ করে এনেছি আমরা। এখন গাছেরও ঝুল ঝাড়তে হয়। তবু বৈশাখ। সমৃদ্ধ প্রকৃতিকে বছরের পর বছর ধামসেও একেবারে শেষ করা সহজ নয়। প্রাণের কী স্বতঃস্ফূর্ত ধারা। ঘরের আলো কেড়ে নিতে পারে যারা, তারা কিন্তু সূর্য চন্দ্রের কাজে পরাজিত। ব্যাণ্ডেল পাঁচকে কথায় কথায় কাত করা যায়। সূর্যকে কে কম্বল চাপা দেবে? গ্রীষ্মের কি তপোক্লিষ্ট রূপ। মাঠ ঘাট জ্বলে যাচ্ছে। সবুজ হয়ে আছে গাছের ঝিলমিলে পাতা। হাল্কা নিঃশ্বাসের মতো নীল আকাশ। বৈশাখের ভোর বড় মিষ্টি। আগে ঘুঘুর ডাকে দুপুর কাঁদত। এখন জোড়া ঘুঘু সকালকে উদাস করে দেয়। ধর্ম দেশ ছাড়া হয়েছে। ইট, ড্রিঙ্ক

অ্যাণ্ড মেরির বদলে হ'ট ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড পেরিশ হয়েছে একালের ধর্ম। যদিও ইট-এর বারোটা বেজে গেছে! ড্রিঙ্ক মানে ঘোলা টিউব-ওলেলের জল। একমাত্র আনন্দের মরে বাঁচা। যাক বাবা আর কেউ মাথায় ঘোল ঢালতে পারবে না। চামচিকিতেও লাথি মারবে না। সমস্যার আলপিন আর ফুটবে না প্যাঁক প্যাঁক করে। যেমন তেমন বাঁচাটাই এ-কালের ধর্ম। তাই সেকালের মতো প্রভাত ফেরী আর পথ পরিক্রমা করে না। ভোরের ভিজে ভিজে বাতাস। দিনের চোখ সবে ফুটছে। সাদা সাদা ফুলে গাছ ছেয়ে গেছে। চাদর বাঁধা হারমোনিয়াম ঝুলছে বুকের কাছে। মৃদঙ্গের মিঠে বোল। ভোরের সুরে দিন জাগছে—রাই জাগো, রাই জাগো, বলে ডাকে শুক শারি। তখন জীবনের একটা ব্যাপ্তি ছিল। কল্পনা ছিল। এত পাকানো ছিল না। আমাদের মগজ তো ধোলাই হয়ে গেছে। বিদেশীরা দেশ ছাড়লেও মন ছাড়েনি। যার ফলে না আমরা ঘরকা না আমরা ঘাটকা। শ্যাম রাখি না কুল অবস্থা। দেহ-বাদ, ভোগ-বাদ পেয়ে বসেছে। এদিকে দেহও নেই, ভোগও নেই, সে রেস্ত কোথায়। ফাস্টলাইফ? হটফুড। কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার শখ। ফাস্টলাইফ? এদেশের রাস্তার তো এই হাল। যানবাহান চলে শমুকগতিতে সময় তো এদেশে স্তব্ধ!

—সাহেবদের হাটান হয়েছে। সাহেব পাড়ার চেকনাই কয়েক বছর ছিল, তারপর প্রশাসনের ন্যাজের ঝাপটায় ভেদাভেদের পাঁচিল চুরমার। এখন বিলকুল 'নেটিভপাড়া'। নেটুদের মনের মত ব্যবস্থা সর্বত্র। একটা ঘাঁটাচটকা ব্যাপার। ভ্যাটভ্যাটে নর্দমা। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। পরশুরাম নিক্ষত্রীয় করেছিলেন—এঁরা বললেন সব চুরমার করে দেবো। রাস্তা বলে আর কিছু আর থাকবে না। খেলার মাঠ থাকবে না। সরোবর দীঘি কিছুই থাকবে না। থাকব আমরা। আমি আর তুমি শুধু নরকগুলজার।

এরা সব কথায় কথায় বিলেত যায়। স্পেন, রোম, ফ্রান্স,

ইতালি, ভিয়েনা, জার্মানী। কত কি দেখে আসে! ছবির মত জনপদ। অস্ট্রিয়া যেন গোটাটাই একটি রম্য উদ্যান। আলোকিত ট্রাফিক আইল্যাণ্ড। ঝলমলে পার্ক। ফোয়ারা। পরিস্কার টানা টানা রাস্তা। সারা দেশটা যেন হাসছে। স্বাস্থ্যের হাসি। সৌন্দর্যের হাসি। কোথাও কোন এলোমেলো ব্যাপার নেই। সর্বত্র শান্তি। সন্ধেবেলা ঘরে ঘরে পিয়ানো বেজে উঠল। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রঙ্গালয়ে অপেরা। এইসব দেখেও কি একটা 'অ্যামবিশান' হয় না—আমরা স্বাধীন। বিজ্ঞানের এত উন্নতি। দেশটাকে একটু সুন্দর করি। অন্তত নেটিভ বদনামটা ঘোচাই। ইওরোপ, আমেরিকার মতো না পারি, মাদ্রাজ কিম্বা বোম্বাইও তো আদর্শ হতে পারত। এমন স্বভাব আঁস্তাকুড় ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। আমাদের কোনও 'টেস্ট' নেই। দেশমাতাকে আমরা গ্রাম্য ঘুঁটে কুড়ুনী করে রাখব। এতবড় শয়তান আমরা—পাবলিক হেলথ এর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থাই আমরা নেব না। নিতে বয়ে গেছে। কিন্তু সেমিনার কবব পাঁচতারা হোটেলে। রঙীন পোস্টার মারব দেয়ালে। কত বড় ভণ্ড আমরা—শহরের কিছু ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ড দেওয়া হল বড় বড় কোম্পানিকে। বেশ হল। নানা কায়দা। যাই হোক, সবই তালি মারা, তার মাঝে সুন্দর উদ্যান। দেখে মন জুড়োতো। আরে যে দেশ হল আইনের মুক্তাঞ্চল, সে দেশে চলে এসব। জনসাধারণ দিলে স্নেহের হাত বুলিয়ে। রেলিং গেল। গাছ গেল। ফোয়ারা ফেঁসে গেল। হয়ে গেল ইউরিন্যাল।

যে দেশে মন্ত্রীরা শুধু ধমক দেন, এই রকমের হবে, এর চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না। রাস্তা। রাস্তা কে মেরামত করবে। বিদ্যুৎ। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা হবে। শিল্প। মেরে ফ্ল্যাট করে দেওয়া হবে। শিক্ষা! কি হয়েছে। হয়েছে। ল অ্যাণ্ড অর্ডার। ঠিক আছে। দুঃখের ব্যাপার এইটাই, দেখেও না দেখা, শুনেও না শোনা।

সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, কণ্ঠস্বরই না। সব ফেকল্ পার্টি।

এ-পক্ষ, ও-পক্ষ দুপক্ষই জানেন—মানুষ বোঝে সব। কি হচ্ছে, দেশ জুড়ে কি চলেছে মানুষ জানে। মুখ খোলেনা না দু'কারণে—[এক] ভয়ে। সশস্ত্র আক্রমণে অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। [দুই] লোভে, স্তাতকরা প্রসাদী পেয়ে থাকে।

দিনের পর দিন এই চলেছে। সব মানুষই কোণ-ঠাসা। কোনও রকমে দিনগত পাপক্ষয়। মুখে মলিন হাসি। মনে ভাল কোনও চিন্তা আসে না। উদ্বেগ। কোথাও কোনও আদর্শের কথা নেই। অনুসরণ নেই। খুঁচিয়ে পশু বের করা হচ্ছে। পারস্পরিক খেয়োখেয়ি। বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা কি সাংঘাতিক বেড়েছে। আত্মহত্যা নিত্য ঘটনা। উদাস পথ-পুলিসের সামনের একের পর এক পথ দুর্ঘটনা। যাকগে বলার কিছু নেই। বুদ্ধিমান মানুষ যখন নির্বুদ্ধির মত শাসনের নামে ভয় দেখায়, প্রশ্ন তৈরি করে, বিদেশী মতবাদের ছায়ায় ডাণ্ডা ঘোরায়, তখন সত্যিই খুব অসহায় মনে হয়। এ কি আত্মবিস্মৃতি! আমাদের নিজেদের কি কিছুই নেই! একেবারে দেউলে।

হে বৈশাখ! বড় বেদনা। বড় হতাশা। পুঞ্জীভূত গ্লানি উড়িয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও।

এ বছর কেমন যাবে

১৩৯৩ হাজির !

হাজির হুজৌর।

কী সংবাদ তোমার হে নববর্ষ।

আসতে হয় তাই এসেছি। উপায় ছিলনা। সময়ের স্রোতে বিরানব্বই ভেসে গেছে। আমি তিরানব্বই। এসেছি। তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে স্টিম রোলারের মতো চলে যাব। কিছুই করতে পারবে না। তোমার বয়েস বেড়ে যাবে আরও একবছর।

আমার কী হবে ? কী ভেল্কি দেখাবে তুমি এ বছর। তোমার গভীর জলে কী লুকিয়ে আছে তা তো জানা নেই।

জানবে কী করে ? আমি তো আর মলমল পরা দিগম্বরা নই। এক ব্যাগ উপন্যাসও নই। পলিথিনে মোড়া উপহার সামগ্রী নই যে, হাতে পেলেই বুঝে যাবে কী মাল আছে গর্ভে। পোস্টমর্টেম না হলে জানবে কী করে, ব্যাটা কী খেয়ে মরেছে। ছিপ ফেলে বসে থাক। যখন যা ওঠে। জীবন হল মাছধরা। ধৈর্য্য আর বরাত। রুই কাতলা উঠতেও পারে, নয় তো কাঁকড়ায় টোপ ঠুকরে বেরিয়ে যাবে। হাতে থাকবে হুইল ছিপ। বছর ঘুরে যাবে। ফাতনায় চোখ রেখে রেখে চোখ ঠিকরে যাবে। তবু তোমায় বসে থাকতেই হবে। যে খেলার যা নিয়ম।

সে তো বুঝলুম। চার করে আর টোপ ফেলে বসে থাকার নামই জীবন ; কিন্তু উপরি পাওনা তো কিছু থাকেই, যেমন ট্রেনের সিজন টিকিট, যেমন কলকাতার কলের জল, বাসের গুঁতো, শীতের সন্ধ্যার ধুলো আর ধোঁয়াভরা বাতাস, যেমন বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, যেমন পুলিসে পাকড়ালে রুলের গুঁতো, সেই রকম ফ্রি পাওনা কিছুই নেই ?

অবশ্যই আছে। যেমন বয়স তোমার এক বছর বাড়বেই।

বছর বছর বাড়বেই। সরকারি অফিসের ইনক্রিমেণ্টের মতো। পায়ের কড়ার মতো। কলতলার শ্যাওলার মতো। বাড়বেই বাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি কবি হলে লিখতে পারবে এই ভাবে ঃ

আজকে খোকা, কালকে দাদা।
অবশেষে দাদু

তবে এর একটা ফুটনোট আছে। জবরদস্ত ধাঁধাও বলতে পারো।

কী রকম ?

বলো তো কাদের বয়েস বাড়ে না ?

কাদের ?

মেয়েদের বয়স বাড়ে না। বছর বছর কমতেই থাকে। শহর কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের সামনাসামনি দুটি বাড়ি। বেলা একটা দেড়টার সময় ওই রাস্তায় গেলে দেখতে পাবে দুই বারান্দায় দুই মহিলা। আড়ি পেতে তাদের দু'জনের কথা শুনো। এ মহিলা জিজ্ঞেস করছেন, 'আজ কী রান্না হল দিদি ? সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলার উত্তর—'আর বলবেন না বড়দি, আজ শুধু বেগুনপোড়া আর ভাত।' তুমি দিদি বলে বলে আমার বয়স বাড়াবে, অতই সোজা, আমি তোমাকে বড়দি বলে আবার ছোট হয়ে যাব। তাছাড়া, জেনে রাখো 'বয়স বিজ্ঞানী' আর 'ত্বক বিজ্ঞানীরা' একেবারে ক্ষেপে গেছে। মেয়েদের বয়েস তারা আঠারো থেকে বিশে একেবারে 'ফিক্সড্' করে দেবে । বয়স বাড়বে কিন্তু আকৃতি পাল্টাবে না।

সে আবার কী ? এমন আবার হয় না কি ?

হচ্ছে রে বাবা হচ্ছে। স্রেফ 'অ্যাপ্লিকেশান'। এটা ওটা সেটা সময় মতো লাগিয়ে যাও ! তারপর 'সাপলিমেনটেশান'।

সে বস্তুটা কী ?

আরে বাবা, রোজ যা খাও তাতে হবে না। যৌবনদায়িনী মালমশলা সিসটেমে ঢালতে হবে। দেয়ালে একটা চার্ট ঝুলবে,

ডায়েট চার্ট, সেই চার্ট মিলিয়ে চেটে যাও খেয়ে যাও চিবিয়ে যাও। তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করি, হনুমান দেখেছ?

মনে হয় দেখেছি। গ্রামের বাড়িতে। শহরে আর হনুমান কোথায়?

ভালো করে দেখেছ? হনুমান বুড়ো হয়? বুড়ো হনুমান দেখেছো কখনও?

বীর হনুমান দেখেছি, বিষম তার মেজাজ। খ্যাক খ্যাক করে তেড়ে আসে। বীর হনুমান দেখতে পার। সব হনুমানই বীর, তা না হলে রাবণরাজাকে ওভাবে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারে। বীর দেখেছো। বুড়ো দেখনি। কারণটা কী। হনুমানের ডায়েট। 'কচি খাও, কাঁচা খাও, ধরে রাখ যৌবন।' সরকার অবশ্য তোমাদের জন্যে সেই ব্যবস্থাই করছেন। কেন্দ্র আর রাজ্য, কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস, তিনটেরই বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছেন। মধ্যবিত্তের চুলো আর জ্বলবে না। তবে হ্যাঁ, একেই বলে বদান্যতা। টিভির রান্না-খরচ তুলে নিয়েছেন। সন্ধেবেলা সপরিবারে টিভির সামনে বোসো আর আলু খাও, মুলো খাও, শশা খাও, গাজর খাও, লেটুস খাও, ছোলা খাও, বাদাম খাও। সব কাঁচা খেকো দেবতা হয়ে যাও। দেখবে চেহারায় কী গ্লেজ! চোখে কী জ্যোতি! বিজ্ঞাপনে যেন ঝকঝকে দাঁত দেখা যায় সেরকম দাঁত। সত্তরেও ফুট কড়াই খাচ্ছ হেসে হেসে। বাবাজি হনুমানের ভাল দিকটা নিতে শেখ। বাঁদরকে আদর্শ করে বসে আছ সব। এই যে লোডশেডিং কেন হয় জানো?

জানি। আমাদের ভোগাবার জন্যে।

আজ্ঞে না। তোমাদের ভালোর জন্যে হয়। চোখ যত অন্ধকারে থাকবে তত জ্যোতি বাড়বে। অ্যাডাপটেশান কাকে বলে জান? মানিয়ে নেওয়া। স্ত্রীর সঙ্গে মানাতে পার। কর্মস্থলে ওপর অলার সঙ্গে পার। অভাবের সঙ্গে পার। স্বভাবের সঙ্গে পার। অন্ধকারের সঙ্গে পারো না। হই হল্লা না করে চোখকে বিশ্রাম দাও। সারাদিন

অনেক সুদৃশ্য কুদৃশ্য দেখলে, রাতের বেলাটায় অন্তত আত্মদর্শনের চেষ্টা করো। জীবজন্তুরা অন্ধকারে থাকতে থাকতে চোখে ফসফরাসের ডিপো পেয়েছে। অন্ধকারে চোখ জ্বলে। জানোয়ে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, এখনই একটু একটু পারছ। পারছ না?

তা অবশ্য পারছি। ধেড়ে ধেড়ে জিনিস মোটামুটি দেখতে পাই। খাট, টেবিল, চেয়ার।

হবে হবে। দৃষ্টি ক্রমশই দেখবে সূক্ষ্মে চলে যাচ্ছে! স্ত্রীর গালের তিলটিও স্পষ্ট দেখতে পাবে। 'ম্যানিপুলেশান' তো খুব শিখেছ, 'আডাপটেশান' টা ভাল করে রপ্ত করে নাও শান্তি পাবে।

সবই তো দেখছি, সাধন ভজনের ব্যাপার। করলে তবে মিলবে। অ্যায়সা কি কিছুই আসবে না!

অবশ্যই আসবে। যেমন একটা দুটো করে পাকা চুল আসবে। ধীরে ধীরে টাক আসবে। চোখে ছানি আসবে। কপালে ভাঁজ আসবে। মুখের বাত সারা শরীরে গেঁটে বাত হয়ে ছড়াবে। রক্তে উচ্চচাপ আসছে। স্মৃতি বিভ্রম আসবে। ধার দেনা আসবে। শেষ বয়সে আত্মীয়-স্বজন আসবে। বিয়ের চিঠি আসবে। চাঁদার তাগাদা আসবে। আলো জ্বালাও আর না জ্বালাও, বিশাল বিশাল বিল আসবে। মেয়ের বিয়ে আসবে। জামাইয়ের বায়না আসবে। ছেলের প্রেম করা বউ আসবে। তুমি চাও না চাও, ঈশ্বর তোমাকে ছপ্পর ফুঁড়ে দেবেন।

বাঃ বাঃ, সেরা সেরা উপহার। কী আসবে না?

শান্তি আসবে না। যতই সাধনা করো শান্তি মিলবে না। যেমন, যতই সেবা করো স্ত্রীর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট কোনও দিন পাবে না। ঈশ্বর মানুষকে সব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছিলেন। আসি প্রভু বলে মানুষ প্রায় চলেও এসেছিল। ঈশ্বরের হঠাৎ কী খেয়াল হল পিছু ডাকলেন, 'ওহে শোনো, দেখি, তোমরা পুঁটলিটা খোলো। এইটা আমি নিয়ে রাখলুম।' 'কী নিলেন আপনি?' 'সামান্য একটা জিনিস, শান্তি। এইটা তোমরা পেলে আমাকে ভুলে যাবে।'

বুঝলে কিছু ! চিতায় না ওঠাতক শাস্তি নেই

বাঁচা গেছে। আর কী আসবে না ?

যে দিন গেল সেই দিনটি আর ফিরে আসবে না। ঘাতকের মতো। গেল আর এল না।

না আসার দলে আর কী আছে ?

স্বীকৃতি। স্বীকৃতি আসবে না। খেটে মরবে প্রোমোশান আসবে না। করে মরবে প্রশংসা আসবে না। ভুগে মরবে তবু মৃত্যু আসবে না। ছোটখাটো জিনিসের মধ্যে কী কী প্রায়ই আসবে না জেনে রাখো। করপোরেশানের জল। কাজের লোক। টেলিফোন-এর ডায়াল টোন। রুটের বাস। বিদেশের পার্সেল। এমারজেনসির ডাক্তার। গৃহশিক্ষক। গানের মাস্টারমশাই। বাড়ি তৈরির মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, ইলেকট্রিসিযান, দর্জির দোকানে করতে দেওয়া জামা প্যান্ট, লনড্রিতে কাচতে দেওয়া জামা কাপড়, জ্যোতিষীর বলা ভাগ্য। স্ত্রী দেওয়া প্রতিশ্রুতি। না আসার তালিকায় এদের তুমি স্বচ্ছন্দে লিখে রাখতে পারো, আর একটা অবশ্যই লিখে রাখবে সেটি হল, রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার। আজকাল তো আবাব নতুন নিয়ম চালু হয়েছে—অনেকটা সেই প্রবাদের মতো, পর্বত-এর কাছে মহম্মদ না গেলে পর্বতই চলে আসবে মহম্মদের কাছে। একই রিকশায় মা ছেলে আর খালি সিলিণ্ডার। সিলিণ্ডার নামল ফুটপাথের লাইনে, ছেলে নেমে গেল স্কুলে, মা ফিরে এল সিলিণ্ডারের লাইনে। শেষবেলায় আধমরা হয়ে ফিরে এল।

এই তাহলে আমাদের ভাগ্য !

হ্যাঁ, এই তোমাদেব ভাগ্য। তোমাদের ভাগ্য তৈরি হচ্ছে মুদীর দোকানে। সেখানে মাসকাবারী খাতা আর গৃহিনীর হাতে সংসার। চালাও চালিয়ে যাও। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। প্রতি মাসেই পাওনার অঙ্ক দেখে কুকুর শাবকের মতো কুঁই কুঁই করবে ; কিন্তু পাওনা তোমাকে মেটাতেই হবে। একেই উপনিবদ বলেছেন নান্য পন্থা। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলেই তোমার সুগৃহিনী

বলবেন—লুচি খাবার সময় মনে ছিল না, মনে ছিল না বন্ধুবান্ধব নিয়ে কাপ কাপ চা খাবার সময় চা আর চিনির কিলো কত। তোমাদের ভাগ্য পড়ে আছে পাড়ার ডিসপেনসারিতে। গুপী ডাক্তার আসবেন, প্রেসক্রিপসান ছাড়বেন আর তোমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী হবে। এখনকার অ্যালোপাথি বটগাছের মতো টান মারলেই দেখবে শেকড়বাকড় নিয়ে উঠে এল স্টুল ব্লাড, ইউরিন স্পুটাম, এক্স রে স্ক্যানিং, সব জড়ামড়ি, তুমি সর্বস্বান্ত।

এইবার জানতে ইচ্ছে করছে এই নশ্বর পৃথিবীতে কারা অমর ?

শত্রু অমর। অবিনাশী। শত্রু মরে না। মরে না অ্যামিবারোসিস, জিয়ার্ডিয়াসিসের জীবাণু। মরে না মানুষের অহঙ্কার। উইপোকা, ছারপোকা, মশা মরে না। ভালবাসা মরে না, ঘৃণাও মরে না।

আমার শেষ প্রশ্ন, বছরটা সত্যিই কেমন যাবে ?

ভালোই যাবে। শুয়ে, বসে, ভুগে, ভুগিয়ে খ্যাচাখেচি, মান অভিমানে প্রতি বছর যেমন যায়, এ বছরও সেই রকম চলে যাবে। একেই বলে, 'চলছে চলবে।'

সবই তো ছোট দিন

সায়েবরা চলে গিয়ে বড়দিন কেমন যেন মিইয়ে গেছে। শহরও ভেঙে চুরে গেছে। বৃটিশ রাজমুকুটের মণি শহর কলকাতা সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে হতশ্রী। তেমন শীতও আর পড়ে না। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল জীবনে আর আগের সুখ নেই। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান সকলেরই এক অবস্থা। সকলেই আমরা ক্রুশবিদ্ধ যীশু। মাথায় অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তার কাঁটার মুকুট পরে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি।

অতীতের কথা মনে পড়ে। বড়দিন শুধু খ্রীষ্টানের ছিল না, ছোঁয়া এসে লাগত আমাদের জীবনে। উৎসবের সাজে সেজে উঠত কলকাতা। হিন্দুর উৎসব, পালা পার্বন বড় শব্দময়। হই হই রই রই না হলে ঠিক জমে না। বাবার মাথায় জল ঢালা থেকে রথের দড়ি ধরে টানা সবেতেই একটা যুদ্ধংদেহি ভাব। দু একজন পদদলিত হলেও দুঃখের কিছু নেই। বরং আনন্দের কথা ভাগ্যের কথা। মৃত সোজা স্বর্গের পাশপোর্ট পেলেন। হিন্দুর বিয়ে একটা গ্যালো গ্যালো ব্যাপার। বর এলো না তো-যেন ডাকাত পড়ল। মার মার কাট কাট ব্যাপার। ইদানীং সানাইয়ের বদলে যুক্ত হয়েছে হিন্দি ছায়াছবির গান। বড় ঘরে ইলেকট্রনিক জগঝম্প মিউজিক। রাস্তার কোণে ডাঁই করা কলাপাতা, খাদ্যের ভুক্তাবশেষ, চিংড়ি মাছের খোলা। সাতদিন গ্যাস মাস্ক পরে হাঁটাচলা করলেই ভালো হয়। ঘরে রজনীগন্ধা, বাইরে আবর্জনার পচা গন্ধ। প্রাণ যায় রে পাঁচু বললে শুনছে কে? আমাদের সংজ্ঞাটাই অন্যরকম। আমাদের জীবনে বিশেষ পার্থক্য নেই। আমরাও ভগবান, গরুও ভগবান। যীশুর ধর্মে মানুষ ভগবানের পুত্র। তিনি যে সব আচরণ বিধি রেখে গেছেন, তার ভিত্তিভূমি হল শৃঙ্খলা, অসীম ডিসিপ্লিন। সব ব্যাপারেই একটা পরিচ্ছন্নতা।

বিশ্বজুড়ে যার নাম খ্রীষ্টান ডিসিপ্লিন। চার্চের ঘণ্টার মধ্যে একটা গম্ভীর হিন্দু হিন্দু ভাব আছে। বৈদান্তিক হিন্দু। চার্চের আকাশ ছোঁয়া ধারালো গঠন যেন মুলাধার চক্র থেকে সোজা সহস্রধারে উঠে গেছে। পরিবেশে হিন্দু পুরোহিতের সযত্নে লালিত নোংরামি নেই। ফুল, বেলপাতা, গঙ্গাজল চটকানো প্যাঁকপেঁকে কোন ব্যাপার নেই। চার্চের চারপাশ যেন হিন্দুর তপোবন। রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য কয়েকটি মিশন এই মিশনারী আদর্শ মেনে চলেন বলেই পরিবেশের প্রভাবে অধার্মিকও ছুটে যান। খ্রীষ্টধর্মই শেখাতে চায়, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্স্ট টু গডলিনেশ। কলকাতার মহাপ্রভুদের কে শেখাবে! হিন্দু মতে শহরের শ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চন সমাপ্ত। গয়ার প্রেতশিলায় পিণ্ডোৎসর্গই যা বাকি।

খ্রীষ্টান জনসংখ্যা কমে এসেছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা চলে গেছেন হয় অষ্ট্রেলিয়ায়, না হয় ক্যানাডায়। বহুদিন বড় বড় চার্চের গাত্রমার্জনা হয়নি। আগে বছরে বছরে হত। সংলগ্ন উদ্যানে আগের মত শীতের মরসুমী ফুলে হেসে ওঠে না। কবর-খানার মর্মর ফলক হয় অপহৃত নয় শ্যাওলাবৃত। প্রাচীনেরও আলাদা একধরণের সৌন্দর্য থাকে। এখানে প্রাচীন বড় হতশ্রী। হয় অর্থাভাবে, না হয় উদাসীনতায়।

বৃটিশ শাসনের মধ্যদিনে বড়দিন ছিল বড়িয়া দিন। জাঁকালো শীত, কমলালেবু, স্যুট-বুট, চারদিনের ছুটি, গোলাপী নেশা, ইডেনের গোরাবাদ্যি, চিড়িয়াখানার চিড়িয়া, সব মিলিয়ে পয়সাঅলা বাবুদের ফুর্তির সময়। দিনের বড় ছোট বোঝা না গেলেও দিলের দরাজ ভাব ধরা পড়ত। ধর্ম বিদেশের, আমোদ স্বদেশের। ধর্মে আমরা হিন্দু হলেও আমোদে পুরো খ্রীস্টান। বৃটিশ সূর্য অস্ত যেত না একটি কারণে, ইংরেজী ভাষা আর শিক্ষার প্রসারে। সিংহ যেখানে গর্জন করছে না, সেখানেও শেক্সপীয়র, শেলি, বায়রন, টেনিসন বসে আসেন। বন্দুক যা পারে না, ভাষা তা সহজে পারে। ধুতি, পাঞ্জাবি খুলিয়ে, প্যান্ট, টাই পরায়। মেঝে

থেকে খাবার টেবিলে তোলে। কাঁটা চামচে ধরতে শেখায়। মেয়েদের ঘোমটা খসায়। নরখাদককে কেকখাদক করে। হিন্দু সভ্যতা আমরা গ্রহণ করিনি। বেদান্ত বড় কঠিন বলে ইঁদুরকে দান করেছি। তপোবন তুড়ে দিয়েছি। তপোবনের ওপর দিয়ে রেললাইন গেছে। তৈরি হয়েছে পিকনিক স্পট। কলের চিমনি কালো ধোঁয়া ফুঁসছে। ইংরেজী ভাষার গুণে আমরা ইংরেজী সভ্যতার সঙ্গে সহজে একাত্ম হতে পেরেছি। ইংরেজই আমাদের লেডিজ-ফার্স্ট শিখিয়েছে। শিখিয়েছে লাভ দাই নেবার। ইংরেজের কাছ থেকেই জাতীয়তাবোধ শিখেছি। স্ত্রীকে পেটাবার আগে মন এসে হাত সরিয়ে দেয়। মেয়েদের লিবারেশানের কথা মনে পড়ে। নুইসেন্স্ আর ভালগার শব্দ দুটি অসভ্যতার টুঁটি চেপে ধরে।

কোথায় গেল কলকাতার সেই সব বিভাগীয় বিপনী। বিশাল বিশাল শো-উইণ্ডো। সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রমাণ মাপের ম্যানিকুইন। বড়দিনের মেজাজ আনে সাজানো দোকান পরিষ্কার ফুটপাত, সজ্জিত দোকান, খ্রীস্টমাস ট্রি থেকে জরির তারা আর অভ্রচিকচিকে ঘণ্টা ঝুলছে। এক পাশে হাসি হাসি মুখ সাণ্টাক্লস। এখন পড়ে আছে সবেধন নীলমনি নিউমার্কেট। সেখানেই দিশি সায়েবদের গুঁতোগুঁতি। চারপাশ জবজবে নরক। ইউরিন্যাল, শূকর মাংসের দুর্গন্ধী দোকান। কোদলানো ফুটপাথ। সায়েবপাড়া পার্কস্ট্রিট আর তার আশেপাশে কোণঠাসা। সায়েবি দোকান এখন দিশি হাতে। সুইস আর ইতালিয়ান বেকাররা বিদায় নিয়েছেন। কেকের নামে যা বিক্রি হয় তা প্রায় ময়দার বাহারি তালের মত।

দিশি সায়েবরা ধর্মটর্ম তেমন মানেন না। প্রথাতেও নেই, মনেও নেই। তাঁরা শুধু মদ্যপানের একটা উপলক্ষ খোঁজেন। বড়দিন আর নিউইয়ার্স সেই রকম দুটি দিন আমরা কতটা সায়েব হয়েছি তার প্রকাশ মদের গেলাসে। যীশুর বলেছিলেন,

'কোনও ভয় নেই, আমার অনুসরণ কর।' আমরা তাঁর মানবতার অনুসরণ না করে গেলাসে জীবাত্মার মুক্তি খুঁজি। তিনি বলেছিলেন, 'এখন থেকে মাছের বদলে তোমাদের কাজ হবে মানুষ ধরা। তোমরা জালে মাছ ধর মেরে খাবার জন্যে। এখন থেকে তোমাদের জীবন মানুষকে অমৃতের ঠিকানা দেবে, তাদের অষ্টপাশ মোচন করে অমৃত অভয় পদের দিশারী করবে।' হায় যীশু! কোথায় সেই মানব। সকলেই তো নিজের কোলে ঝোল টানায় ব্যস্ত। প্রতিটি মানুষ আজ লোভের শিকার। একদল লোভের জাল ফেলে মানুষ টানছে, অমৃতের বদলে গরল গেলাচ্ছে। একের পেছনে আরেককে লেলিয়ে দিচ্ছে। সাদা টাকাকে কালো বানিয়ে নেচে কুঁদে একশা করছে। ওদিকে হাজার হাজার অর্ধনগ্ন যীশু আস্তাবলে পড়ে আছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দেশপ্রেমের কথা, আত্মত্যাগের কথা, দারিদ্র মোচনের কথা। পৃথিবী এখন উন্মাদের পৃথিবী।

সব ধর্মই মানুষকে মানুষের উপযোগী করতে চায়। হলে কি হবে, ধর্মে আর ক্ষমতায় আকাশ জমিন ফারাক। মানুষের বাইরেটা চাপকানের মত, ভেতরটা কেমন আমরা নিজেরাই জানি না। মানুষের ভালো করতে চেয়ে এক যীশু কেন, শতশত যীশু ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছেন। মানুষের হাতেই মৃত্যু। স্মৃতিতে মঠ বানিয়ে বারে বারে প্রমাণ করা কুকুরের বাঁকা ন্যাজ সহজে সমান হবার নয়। মানুষ স্নেহ চায়, মায়া চায়, মমতা চায়, উপকার চায়, সাহায্য চায়, সমাজ চায়, সুরক্ষা চায অথচ যাব কাছ থেকে এসব পাওয়া যায় তাকে ধরে শূলে চাপায়। যে অন্যের জন্যে কাষ্ঠা-হরণে যায় তাকে বাঘের মুখে ফেলে রেখে চলে আসা। 'সকল দুঃখের চেয়ে বড়ো দুঃখ মানুষের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তাব কলুষ।' [রবীন্দ্রনাথ]

এই কলুষ দূর করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের স্তর

থেকে অতি মানবের স্তবে কেউ কেউ হয়তো আরোহণ করবেন। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন, 'লক্ষে একটি দুটি কাটলে ঘুড়ি হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।' রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যে উদাহরণ দিয়েছেন—'বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন, মহামানবের সঙ্গিহীন নির্জন বিচরণভূমি কোনদিনই জনাকীর্ণ হবে না। আমরা তাদের দেবতাদের আসনে বসাতে জানি, তাঁদের জীবন যাপনের আনন্দময় ক্লেশস্বীকারে রাজি নই। জন্মদিনে আলো, মৃতুদিনে মালা এই আমাদের ঋণ স্বীকার! যীশু, চৈতন্য, **কৃষ্ণ** রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর সকলেই প্রায় একলা পথিক। আমাকে অনুসরণ করো। কেউ কি অনুসরণ করেছে? প্রাণহীন প্রথায় সব ভেসে গেছে। বড় সুন্দর বলেছেন রবীন্দ্রনাথ:

'আমাদের জীবনে তার জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তার মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। বড়দিন মানে যীশুর জন্মদিন নয়। যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন—।'

'জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠেছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানব সন্তানের কাছে—আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়।'

এই হল আর এক সত্য। দেব আর দানবের সহাবস্থান। আমাকে অনুসরণ করো—আহ্বান আমরা শুনেছি। বৃথা। In vain have I smitten your children they received no correction: your own sword hath devoured your praphets, like a destroying lion.

নির্বাচন এসে গেলে আমার ভীষণ মজা গেল। এই আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, কুমড়োর জীবনে বেশ বড় রকমের একটা উত্তেজনা। যেন টেস্ট ক্রিকেট অথবা ওয়ান ডে ম্যাচ! যেন ইস্টবেঙ্গল মোহন-বাগানের লড়াই। পশ্চিম বাংলায় এখন যা হচ্ছে তা হল রাজীব জ্যোতিব শিল্ড ফাইন্যাল।

হাটে হাড়ি ভাঙ্গার মতো, এ ওর ঘরের খবর ও এর ঘরের খবর মার্কেটে ফাঁস করে দিচ্ছে। সেইটাই তো মজা। আমরা আদার ব্যাপারি, আমাদের জাহাজের খবরে কী দরকার। আমরা ঘরের খবর জানতে চাই। আমরা চাই কোঁদল! অল্পস্বল্প মারদাঙ্গা হলেও ক্ষতি নেই। যে পূজোর যা নৈবেদ্য। নারকোলের বদলে ভোট পুজোয় নারকুলে বোম পড়লে যেড়োশোপচার সিদ্ধ হল। ভোট দিয়ে কোনও দিন মানুষের বরাত ফেরেনি, ফিরতে পারে না। ভোট দিলে ব্যাঙ্ক ব্যালেনস বাড়ে না। বেকারের চাকরি হয় না, রেশানে বাসমতী চাল আসে না, স্টপেজে দাঁড়ানো মাত্রই আধখালি বাস আসে না, মাইনে বাড়ে না, বিনাপণে মেয়ে পার করা যায় না। ভোট একটা শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, জীবন ছাড়া ব্যাপার। দিতে হয়। দাতার মতো দিতে হয়। দিতে দিতে নাঙ্গা বাবা হয়ে যেতে হয়। প্রত্যাশা কোরো না প্রত্যাশা একটা নীচতা। উদার মন নিয়ে ফুটো বাক্সে পায়সা ফেলার মতো ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করে ফেলে দাও।

কেউ যদি এম এল এ হয়, কি মন্ত্রী হয় হোক না। হয়ে বেশ একটু ইয়েটিয়ে করে নিক না। দিন তো চিরকাল কারুর সমান যায় না। জীবন তো আজ আছে কাল নেই আর গদি, সে তো আরও ক্ষণস্থায়ী। ভোটের ব্যাপারে চাই পরমপুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি। নীর আর ক্ষীরের মিশ্রণ থেকে ক্ষীরটুকু হাঁসের মতো শুষে নিতে

হবে। সাধারণ মানুষের কাছে ভোটের ক্ষীর হল বহু রকমের মজা। প্রথম হল কথার লড়াই। কার কথার কত ধার! ওদিক থেকে রাজীববাবু ছাড়ছেন, এদিক থেকে জ্যোতিবাবু। উনি বলছেন তিনশো কোটি টাকা গেল কোথায়! এদিক থেকে উত্তর, টাকা দিয়েছেন না কি! ওদিক থেকে প্রশ্ন, কেন্দ্রের কাজে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার উন্নতি কি চান না! এদিক থেকে উত্তর, লায়ার। ওদিক থেকে প্রতিশ্রুতি, জিতে গদিতে বসলেই দশ লক্ষ বেকারের চাকরি। এদিক থেকে ফুৎকার, চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া, না গাছের ফল! নাড়া দিলেই পাকা আমলকির মতো ঝরে পড়বে! ওদিকের প্রতিশ্রুতি, গদিতে বসলেই দু টাকা কিলো যোজনগন্ধা চাল। এদিকের কুঁক কুঁক হাসি, সে চাল কোন ক্ষেতে ফলে মাইরি! এই যে উতোর চাপান, এ যেন রবিশঙ্করের সেতার আর জাকির হোসেনের তবলার সওয়াল-জবাব।

যাক একটা উপকার হচ্ছে, দাঁত বের করা দেয়াল, যার গায়ে সারা বছর জলবিয়োগ হত, সেই দেয়ালে এক পোঁচড়া করে হোয়াইটওয়াশ পড়েছে, তার ওপর জমে উঠেছে কবির লড়াই। দেয়ালের লিখন আমাদের কপালের লিখনকে খণ্ডাতে পারবে না। কপালে যা লেখা আছে তা ফলবেই। সকালে শয্যা ত্যাগ, সারা দিন হা অন্ন হা অন্ন। মধ্যরাতে নপুস। ঘণ্টা সাতেক নাসিকা গর্জন। প্রাতে সংবাদপত্র। সেখানে নিরন্তর গবেষণা, অমুক জেলার তমুকচন্দ্র বলছেন, এম এল এ মশাই একবারই এসেছিলেন পাঁচ বছর আগে, তারপর আর তিনি এলাকা মাড়াবার অবসর পাননি। কল আছে জল নেই। টিউবওয়েল আছে হাতল নেই। গর্ত আছে রাস্তা নেই। ছাত্র আছে স্কুল নেই। কথা আছে কাজ নেই। অমুক এলাকায় দু দলের প্রার্থীই জোরদার। ধনাদা আর নোনাদা। লড়াই খুব জমবে। তমুক এলাকায় ভোট ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়ে আশাতীত ফল হবার সম্ভাবনা।

ব্যস্ত সাংবাদিকরা পাগলের মতো এলাকায় এলাকায় টহল

মারছেন। ইলেকসান ফোরকাস্ট। পরে মেলানো হবে। মিলিয়ে নম্বর দেওয়া হবে। তখন আবার আর এক মজা, কোন কাগজ বেশি মেলাতে পেরেছ, কোন কাগজ পারেনি।

রাজীব একাদশ ভার্সাস জ্যোতি একাদশ। রাজীব হলেন বিলিতি কোচ, সেণ্টার ফরোয়ার্ড প্রিয়দাস। সাঁসা করে বল নিয়ে ঢুকছেন, একই ড্রিবল করছেন, বিশেষ থ্রু-পাশ দিচ্ছেন না। এ টিমের দুর্ধর্ষ ব্যাক জ্যোতিবাবু। একাই ডিফেণ্ড করছেন।

এবারের খেলাটা আর ফুটবল নেই, হয়ে গেছে ব্যাডমিণ্টন। চাপসা চাপসি। রাজীববাবু ও কোর্ট থেকে হাঁকড়াচ্ছেন, এ কোর্ট থেকে ফেরাচ্ছেন জ্যোতিবাবু। জ্যোতিবাবু মারছেন এপাশ থেকে প্লেস করছেন ওপাশে। কে এখন চ্যাম্পিয়ান হবেন দেখা যাক। 'দু' হাতেই ভাল মার রয়েছে।

আজকাল আর নির্বাচনী সভা তেমন জমে না। মানুষ বক্তৃতা শুনে শুনে ক্লান্ত। সাংবাদিকরা বলছেন, আমরা ভোটাররা না কি বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছি, অনেকটা সে-যুগের অত্যাচারিতা কুল-বধূর মতো। যাদের বুক ফাটত; কিন্তু মুখ ফুটত না! মনের কথা মনেই ধরা আছে, আমরা মুখে কিছু বলছি না। বলব ফুটো বাক্সে নিভৃতে ফেলা একটি ব্যালটে। তবে যে পুজোর যা মন্ত্র। পথসভা করতেই হয়। ওদিকে পাতাল রেলের ঘ্যাজোরম্যাজোর; বিশাল বিশাল বকরাক্ষসের মতো চিরুণদাঁতী যন্ত্র মাটি কোদলাচ্ছে এদিকে পাশের সুঁড়ি গলিতে আধো অন্ধকারে একটি মাইক নিয়ে গলি-সভা করছেন ক্যাণ্ডিডেট। সামনে এক ডজন মাত্র শ্রোতা। তা হোক, থেকে থেকে বন্ধুগণের সম্বোধন দিয়ে, নরম গরম সে কি আস্ফালন। প্রতিবারই নির্বাচনের প্রাক্কালে বিপ্লবীদের শ্রীমুখ থেকে কত কী ঝরে পড়ে। শুনলে, পুলক, হর্ষ, স্বেদ, কম্প শাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণই শরীরে ফুটে ওঠে। দিন আগত ওই। ২৩-এর পর ২৪-এর রাতটা পার হয় কি, হয় না, দেশটা এদের হাতে একেবারে অন্য চেহারা নেবে। পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল, কাননে

কুসুমকলি সকলই ফুটিল। আধো অন্ধকারে বক্তা অদৃশ্য শত্রুর দিকে থেকে থেকে ঘুসি ছুঁড়ছেন আর ঘিসিংঘিসিং করছেন। যাক তবু এই সময় আমরা ভোটাররা মাসখানেকের জন্যে অন্তত এদলের ওদলের বন্ধু হয়ে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করি। তারপর চুকে বুকে গেলে কে কার বন্ধু। আবার পাঁচ বছরের জন্যে আমরা যে যার সব মায়ের ভোগে চলে যাব।

'ও দাদা, তুমি যে তখন অত সব বললে, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, তা কী হল ভাই! আমরা ফি দিলুম, তোমরা তো এক পুরিয়াও মেডিসিন ছাড়লে না।' দাদা বললে, 'দুর মুখ্যু, ভোটের পর বোতলের জল আর ফ্যাস করে না কি!' সে গল্পটা কী গুরু! তাহলে শোনো। আদর করে ভোটার ধরে আনা হয়েছে। প্রার্থীর ক্যাম্পে বসিয়ে তাকে লেবোনেড সেবা করানো হচ্ছে। ছিপি খুলতেই জল ফোঁস করে উঠল। তিনি ভোট দিয়ে বেরনোর পর আর এক বোতল জল চাইলেন। এবার প্লেন সাদা জল। নে ব্যাটা খা। ভোটার বললে, এ কি ফোঁস করল না যে! সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীর চেলারা বললে, ভোটের পর জল আর ফোঁস করে না। যা ব্যাটা বাড়ি যা।

এই নির্বাচনের সময়, ভোটাররা দুটি প্রাচীন গান স্মরনে রাখতে পারেন। একটি গান রামকুমারবাবুর গলায় প্রায়ই শোনা যায় — বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে ধরো মুখে মা, মা বুলি গলার কাঁটা সরে গেলে মাকে সবাই যে ভুলি। এখানে মা হলেন ভোটার। ভোট দাও, কলাপোড়া খাও। আর একটা গান ভোটের সময় ভোটারদের সব সময় গুনগুন করা উচিত—'তুমি কে, কে তোমার' বলে জীব বের করে 'আকিঞ্চন' কে তোমার ভাই! বন্ধুগণ বলে বটে, তবে সত্যিই কি কেউ কারুর বন্ধু। নির্বাচনের পর কোন নেতা বা মন্ত্রীর কাছে যাও না, তখন দেখতেই পাবে তুমি কেমন বন্ধু। একটা জিনিস আমাদের বোঝা উচিত, নেতা বা মন্ত্রী বা এম, এল, এ ক

জনকে সন্তুষ্ট করতে পারেন! সবাই তো হাঁ করে আছে, খাবি খাচ্ছে। আগে নিজের লোক, চামচাদের খাইয়ে তারপর তো অন্য সকলে। তারপর নিজের কথাও ভাবতে হবে? এ তো আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো নয়। সোনার হরিণ ধরতে ছোটা। উদভ্রান্তের মতো গলাবাজি, প্রাণভয়, মাবদাঙ্গা, এর কোনও প্রতিদান থাকবে না! এমন হতে পারে! দেশ সেবার জন্যে অকারণে কেউ হাঁকোরপাকোর করে! এমনিই তো দেশে চাকরি বাকরির এই অবস্থা। বিরাট বিরাট বিশাল বিশাল শিক্ষিত ব্যক্তি গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। দাড়িকামাবার ব্লেড কেনারও পয়সা নেই। সংসারপাতার রেস্তো নেই বলে প্রেম বেড়ে যাচ্ছে। মশা আর প্রেম দুটোই বাড়ছে। কোনও স্প্রে দিয়েই বাগে আনা যাচ্ছে না। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দেশসেবার মতো জীবিকা আছে! প্রথম দিকে একটু হাঁটাহাঁটি, চিৎকার চেঁচামেচি করতে হবে; তারপর তো সোজা পথ। বক্তৃতার একটা পেটেন্ট আছে। সেইটা আয়ত্ত করা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। যাত্রার যেমন হাসি রাজনীতির তেমনি বক্তৃতা। অনর্গল বলে যেতে হবে। শব্দ আর শব্দ। মানেটানে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। গলা এই তোলো এই নামাও। ধমকে ধমকে, গমকে গমকে বলে যাও। শুধু হোঁচট খেও না। হোসপাইপে জল দেবার মতো মুখের পাইপে শব্দ নিয়ে যাও। মানুষকে বক্তৃতা ছাড়া আর কী-ই বা দেবার আছে। এর বাইরে কিছু দিতে গেলেই নিজেদের ভাগে টান পড়ে যাবে। বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু দিতে হলে মেটিরিয়াল কিছু না দেওয়াই ভালো। রাখতে পারবে না, যত্ন নেই, নষ্ট করে ফেলবে। অ্যাবস্ট্রাক্ট দাও। যেমন মতবাদ, যেমন ত্যাগের আদর্শ। পরনের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে দাও বন্ধুগণ। একটাকা রোজগার হলে আশি পয়সা ট্যাক্স দাও। দেশের জন্যে সেবকদের হাতে দিতে শেখো। বেদান্তের দেশ, ধর্মের দেশ। শোনেননি, ভোগ একপ্রকার রোগ বিশেষ। তোমাদের হাতে

একটা পার্ক দেওয়া মানে, গেঁজেল আর সমাজবিরোধীদের আড্ডা হওয়া। রাস্তা দেওয়া মানেই এ ও সে এসে গর্ত খুঁড়বে। হাসপাতাল দেওয়া মানে বাড়ির লোকের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হতে দেওয়া। আপনজন অসুস্থ হলেই, দাও তাকে হাসপাতালে, বেশ মজা! হাসপাতালের পরিবেশ আমরা ইচ্ছে করে এমন করে দিচ্ছি যাতে যাবার নাম করলেই ভয়ে আতঙ্কে রোগ ভালো হয়ে যায় বা যে শুধু ভোগাবে, ভোগাতে ভোগাতে গেরস্থকে সর্বস্বান্ত করে সেই মায়ের ভোগেই যাবে, হাসপাতাল যেন সেই যাওয়াটাকেই একটু কুইক করে দেয়। আধুনিক ভাষায় একে বলে রিভার্স প্ল্যানিং। যাঁরা গাড়ি চালান তাঁরা জানেন ব্যাক গিয়ারে গাড়ি চালানো কত শক্ত! সেই শক্ত কাজটাই এখন করা হচ্ছে। ভোটারদের কাছে একটিই নিবেদন, চাইবেন কেন, চেয়ে নিজেকে ছোট করবেন কেন! জীবন যে রকম পেয়েছেন মৃত্যুও সেইরকম না চাইতেই পাবেন। জীবনের এই তো সবচেয়ে বড় জুটো পাওনা। এর মাঝে ছুটকো ছাটকা হ্যাঁচড়া ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামানো!

এবারের নির্বাচনের গোটাকতক ইস্যু চোখে পড়ছে। রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা, আমার হাতে নয়। রাজ্যের হাতে আরও টাকা, আমার হাতে নয়। জাতীয় সংহতি ও ঐক্য। দলীয় সংহতি বা ঐক্য নয়। দল কাঁচের গেলাসের মতো টুকরো হয়ে যাক। এবারে তো একই কেন্দ্রে একই দলের একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন। অবশ্য এব্যাপারও শাস্ত্রসম্মত। সেই আমরা শুনে আসছি না! নৈকষ্য-কুলীন আর ভঙ্গ-কুলীন। দল, ভঙ্গদল, ভঙ্গ ভঙ্গ দল। হোমিওপ্যাথির ডাইলিউশান। যত ডাইলিউট হচ্ছে তত সেবা করার পোটেনসি বা রস বাড়ছে।

সে যাই হোক, ওইটাই ভালো লাগে, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য বা তীর্থঙ্কর যেন মাধুকরীতে বেরিয়েছেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বৃষকাষ্ঠের মতো

প্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছেন গৃহস্থের শ্যাওলাধরা অঙ্গনে। আসেপাশে সুস্মিত সংকীর্তনের দোয়ারকির দল। প্রার্থী মধুর হেসে মাথাটি নত করলেন, 'আশীর্বাদ করুন মা' মাথা তুললেন। করুণ মুখচ্ছবি! সন্তান যেন সন্ন্যাস নিয়ে বিদায় নিতে এসেছেন। এরই মাঝে একজন ভেটারেন প্রার্থী আছেন, তিনি কখনও হারেন, কখনও জেতেন, তাঁর টেকনিক হল, মা বলেই ফেউ ফেউ করে কেঁদে ফেলা।

তারপর! অন্য দৃশ্য। বিজয়ী প্রার্থী মিছিল করে লরির মাথায় চেপে চলেছেন। ঘাড় উঁচু। গলায় মালার পরে মালা, মাথায় আবীর। চেলাদের চেহারা নিমেষে চামুণ্ডায় রূপান্তরিত। বিশাল চিৎকার। বিপুল পটকা-বিস্ফোরণ। জিতলো কে? আবার কে? আনতমস্তক সেই প্রার্থীর তাকাবার ধরনটাই তখন আলাদা। উদ্ধত সুদূর। তিনি তখন আর সাধারণের নয়, দলের। পার্টির একজন। সাধারণের তিনি কেউ নন। সংখ্যা-গরিষ্ঠ শাসক দলের একটি সংখ্যা মাত্র।

আমার সেই বয়সে একবার প্রেমে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল। সেই বয়েস? যে বয়েসে ঠোঁটের ওপর কাঁচ কাঁচ গোঁফের ভুরো জন্মায়। দাড়িতে দু-এক গাছা ছাগুলে চুল দেখা দেয়। গলাটা একটু ভারি ভারি হয়। মানুষ পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। সবজান্তা, হামবড়া ভাব। লঘু গুরু জ্ঞানশূন্য। সব কথাতেই এক কথা, যান যান, আপনি কি বোঝেন, আপনি কি জানেন?

সেই বয়েস।

প্রেমে পড়তে হলে একটি মেয়ে চাই। যে সে মেয়ে হলে হবে না। সুন্দরী হওয়া চাই। ডানা কাটা না হোক, দেখলে যেন প্রেমের উদয় হয়। নায়িকাদের বর্ণনা কত উপন্যাসে পেয়েছি। ছায়াছবির পর্দায় দেখেছি। চাঁদের আলোর ঝিলিক ফুটছে। গাছের ডাল নায়িকা গান গাইছে। ঝোপে কোকিল ডাকছে কু-উ-উ।

আমার বন্ধু সুখেন সেই বয়েসেই আমার চেয়ে অনেক বেশি পেকেছিল। হিন্দী সিনেমা হুমুড়ি চালে দেখত। ইংরেজি ছবির হিরো-হিরোইনের নাম কণ্ঠস্থ ছিল। বুকপকেটে ম্যারিলিন মোনরোর ছবি পুষত। সে এক ছেলে ছিল বটে!

সুখেন বললে, সব মেয়েই তো আর প্রেমে পড়ে না। যেমন ধর সকলের সর্দি হয় না। ন'মাসে ছ'মাসে হয়তো একবারই হল। কারুর আবার বারো মাসই সর্দি। সকাল হল তো ফ্যাচোর ফ্যাচোর হাঁচি। একে বলে সর্দির ধাত। এই রকম কারুর কাশির ধাত, কারুর পেট খারাপের ধাত। সেই রকম কোন কোন মেয়ের প্রেমের ধাত থাকে। ধাত বুঝে এগোতে হয়।

সে আমি কি করে বুঝব ভাই?

খোঁজখবর নিতে হবে। অতই সোজা চাঁদু। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখ। তারপর ঝোপ বুঝে মার কোপ। রাস্তায় ঘাটে, বাসে

ট্রামে যেখানেই দেখবি কোন মেয়ে তোর দিকে পুট্‌স করে তাকিয়েছে, তুই ক্যাবলার মত চোখ সরিয়ে নিবি না, তুইও তাকাবি কটমট করে। বড় বড় চোখে। মেয়েটা যদি আবার তাকায়, তোর চোখে চোখ পড়বেই। চোখে যাদু থাকে, জানিস ?

না ভাই।

কি জানো তুমি ? চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার, তুমি আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

তুই চোখ মারতে বলছিস ? ও ভাই অসভ্য ছেলের কাজ।

তুই একটি গর্দভ। চোখ মারা নয়। চোখে ভাবের খেলা। সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখেছিস ? এই চোখে জল, এই চোখে হাসি, এই চোখে প্রেম এই চোখে ঘৃণা। সব চোখে। চোখেই মনের প্রকাশ। তেমন ভাবে তাকাতে পারলে রয়েল বেঙ্গল ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে।

ও ভাই আমি পারব না। আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আমি কি সুচিত্রা সেন ?

দূর মড়া ! সুচিত্রা সেনের মত অভিনয় ক্ষমতা, চোখের ভাষার কথা বলছি। বাড়িতে বড় আয়না আছে ?

তা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়াবি, দাঁড়িয়ে চোখের ট্রেনিং শুরু করবি। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিবি না। হাসবি কাঁদবি রাগবি গলবি চমকাবি চমকে দিবি। মুখের কিন্তু কোন পরিবর্তন হবে না। সব চোখে। চোখকে খেলাবি।

এই হল তোর প্রেমের প্রথম পাঠ। এইটে উতরে গেলে দ্বিতীয় পাঠ পাবি।

মনে মনে ব্যাপারটা চিন্তা করে সুখেন ইয়ারকি করেছে বলে মনে হল না। সত্যিই তো, বশীকরণ বলে একটা ক্রিয়া অবশ্যই

আছে। তা না হলে পাঁজিতে এত বিজ্ঞাপন থাকে কেন? যাদুকর পি. সি. সরকার হল-সুদ্ধ লোককে হিপনোটাইজ করে কত খেলাই তো দেখিয়ে গেছেন। সেই সময়ের খেলা! নটার সময় সাতটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন!

আমাদের পাড়ার কার্তিককে মেসমেরাইজ করে গুণী ব্যক্তি নাম রেখে গেলেন কাকাতুয়া। বলেছিলেন ফিরে এসে ঠিক করে দোব। তিনি আর ফিরলেন না। সেই থেকে কার্তিক কাকাতুয়া। কাকাতুয়া বললে সাড়া দেয়। কার্তিক বললে সাড়া দেয় না।

দুপুরবেলা বড় বউদির ঘরে চোখের ট্রেনিং শুরু হল। কেউ যেন আবার দেখে না ফেলে। সব তাহলে কেঁচে যাবে। বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। দুপুরের দিকে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ধুঁকতে থাকে। বড় বউদির নাক ডাকে। আমার ছোট বোন পিয়া কলেজে চলে যায়। এই হল সাধনার উপযুক্ত সময়।

নিজের চোখ আগে কখনও আমি এমন করে দেখিনি। কেউ দেখেছেন কি না সন্দেহ আছে। আমরা সাধারণত আয়নার সামনে দাঁড়াই। ঝট্ করে চুল আঁচড়াই সট্ করে সরে আসি। এ একেবারে নিজের মুখোমুখি ফেস টু ফেস। নিজেকে নিজে দেখা। কখনও প্রেমের দৃষ্টিতে, কখনও ঘৃণার দৃষ্টিতে, কখনও আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে আও না পেয়ার করে, লাভ করে, আও না।

দুপুরটা কয়েক দিন এইভাবেই বেশ কাটল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি ঠেকিয়ে। নিজের সঙ্গে নিজে চোখে চোখে কথা বলে। হঠাৎ একদিন পিয়ার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমি জানতুম না ধরা পড়ে গেছি। পিয়া কোন্ সময় পিছন থেকে দেখে সরে পড়েছে। মনে হয় একটু ভয়ও পেয়েছিল। চুপিচুপি বড় বউদিকে বলেছিল, দাদা দুপুরবেলা তোমার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি করে বল তো। আমাদের পুসীটাকে আয়নার সামনে বসিয়ে দিলে ঠিক ওই রকম করে। ফ্যাস-ফোঁস, থাবা-মারা।

বড় বউদি বড় চালাক মেয়ে। দুপুরে বিছানায় পড়ে রইলেন

মটকা মেরে। সাধনপথে বেশ কিছু দূরে এগিয়েছি। একেবারে তন্ময়। চোখে চোখে হাসি চলেছে। বউদি বললে, কি হচ্ছে?

চমকে উঠেছিলুম। ধরা পড়ে গেছি, কি লজ্জা!

বললুম, অভিনেতা হব তো, তাই একটু চোখ সাধছি।

সে আবার কি? লোকে তো গলা সাধে, চোখ সাধা জিনিসটা কি?

আছে, আছে। সে তুমি বুঝবে না বউদি।

কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। ছাদের ঘরে পুরনো বইয়ের গাদা থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া একটা বই পেলুম, ত্র্যটক সাধনা। তিন-চার হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে সবুজ একটা বিন্দু লাগিয়ে, পদ্মাসনে বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক, যেন চোখের পলক না পড়ে। পাঁচ সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড, মিনিট, এক দুই পাঁচ দশ, ঘণ্টায় চলে যাও। তারপর দিনে।

'তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে জ্যোতি খেলিবে। অলৌকিক দৃশ্যসমূহ চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। চরাচরে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। উড্ডীয়মান পক্ষীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলে ভস্ম হইয়া পড়িয়া যাইবে। যাহার দিকে তাকাইবে সে-ই তোমার বশীভূত হইয়া কুক্কুর কুক্কুরীর ন্যায় পদপ্রান্তে পতিত হইবে, কম্পমান শাখার ন্যায়।

ভজন করনা চাহি রে মন্নুয়া, সাধন করনা চাহি রে মন্নুয়া। সেই সাধনে অ্যায়সা ফল ফলল! একদিন রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়ে চলেছে। একটিকে মনে বড় ধরে গেল। মনে হল প্রেমের ধাত। সুখেন যেন বলেছিল, সর্দির ধাত, কাশির ধাত, পেটের অসুখের ধাত। মিষ্টি, নরম নরম চেহারা। অবাক জলপানের মত মুখ। মা দুর্গার মত চোখ। ডুরে শাড়ি পরেছে। রাস্তায় যেন কাঁপন ধরেছে।

ভ্রুচাপে নিহতঃ কটাক্ষবিশিখো নিম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোত্তমম্।

মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তন্নতাং বিম্বোধরো রাগবান্
সদবৃত্ত-স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্ম্মম ক্রীড়তি ॥

টাটকা গীতগোবিন্দ ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসতে লাগল। হে সুন্দরী, তোমার নজরের কা তীর ভুরুর ধনুর ছিলে টেনে অমন করে আর মেরো না! আমার মন ফেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না সখি! এ তো তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তোমার কালো কুটিলকেশ আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছে, এও স্বাভাবিক। তোমার বিম্বফলতুল্য রাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করছে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু তোমার ওই সদবৃত্তস্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবে! আমি সইতে পারি, না বলা কথা, মন নিয়ে ছিনিমিনি সইব না, সইব না।

গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করে ভীষণ সাহস এসে গেল। বল বীর নয়, তাকাও বীর। কি ভাবে তাকিয়েছিলুম জানি না। একটি মেয়ে আর একটিকে বললে, ত্যাখ ভাই, পাগলাটা তোর দিকে কি ভাবে তাকিয়ে আছে! তারপর রাস্তায় ষাঁড় দেখে মেয়েরা যে ভাবে ছুটোপাটি করে পালায়, সেই ভাবে দুজনে, গলাগলি, টলাটলি করতে করতে পালাল। একজনের পা থেকে চটি ছিটকে নর্দমায় পড়ে গেল। অনেক দূরে গিয়ে তারা আর একবার ফিরে তাকাল ভয়ে ভয়ে। যেন দেখছে ষাঁড়টা কত দূরে!

মনে বড় ব্যথা পেলুম। আরও অবাক হলুম, সবাই যখন বলতে লাগল চোখ রাঙাচ্ছ কেন? তোমার চোখ রাঙানির আমরা তোয়াক্কা করি না হে। যার দিকে তাকাই তিনি একই কথা বলেন, চোখ পাকাচ্ছ কেন? মাথা ঠাণ্ডা কর, মাথা ঠাণ্ডা কর। গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে বলতে হয়।

বড় বউদির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠলুম, এ আবার কে রে! চোখ দেখলে মনে হয়, এখুনি গেয়ে উঠবে, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'। চোখের পাতা

পড়ছে না, মণি দুটো পাথরের মত স্থির। নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি। কান ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, আর করব না স্যার।

চোখের ডাক্তার বললেন, এ কি করে এনেছ হে! একে বলে চোখ ঠিকরে যাওয়া। কি করে এ রকম করলে? ভূত দেখলে এ রকম হতে পারে। আমরা পড়ে এসেছি। দেখলুম এই প্রথম। তুমি বোসো, বোসো।

আউটডোরে কোন পেশেন্ট কখনও এমন খাতির পায় না। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে, অন্য রুগীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, তিনি একের পর এক ছাত্র আর অন্যান্য ডাক্তারদের ডেকে এনে দেখাতে লাগলেন। এ রেয়ার কেস, পড়া ছিল, দেখা ছিল না। তাঁরা আসেন, সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখেন, চোখে যন্ত্র লাগান, আর বলেন, রেটিনা হুপ করে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তারী ভাষা বোঝা যায় না। রেটিনা শব্দটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। হুপ, শব্দ তো হনুমানে করে। তার মানে, কিছু একটা হনুমানের মত লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

চোখের পাওয়ার মাপতে মাপতে ডাক্তারবাবু বললেন, সত্যি করে বল তো বাবা, কি করে এমন করলে? ভূত নিশ্চয়ই দেখনি, চোখের সামনে কাউকে কি খুন হতে দেখেছ?

আজ্ঞে, ত্র্যাটক সাধনা।

সেটা কি বস্তু ভাই? পিশাচ সাধনার ধরনের কিছু?

আজ্ঞে না, দেয়ালে সাঁটা একটা সবুজ বিন্দুর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকা।

সর্বনাশ! একে বলে ফিক্সড স্টেয়ার। আই বল সকেটে সেঁটে গেছে। এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে?

আজ্ঞে, প্রাচীন গ্রন্থ।

সেটিকে পুড়িয়ে ফেল। খবরদার, ও সব আর ভুলেও করতে যেও না। এই নাও তোমার চশমার পাওয়ার। সঙ্গে গোটাতিনেক

ব্যায়াম রইল। প্রথম : চোখ নাচানো। ডাইনে ঘোরাও, বাঁয়ে ঘোরাও, ওপরে তোল, নিচে নামাও। দ্বিতীয় : ব্লিংকিং, অনবরত চোখ পিটপিট কর। ননস্টপ। তৃতীয় : কাপিং। হাতের তালু দিয়ে দু'চোখ ঢেকে, মাথা পেছনে হেলাও। শেষ উপদেশ : সুখে আছ, তাই থাক, ভূতের কিল খেতে যেও না। কেমন ?

চোখ বাঁচাতে শুরু হল চোখের ব্যায়াম। চোখ ঘোরানো, চোখ নাচানো, চোখ পিট পিট, পাতা ফেলা আর খোলা। সুখেন ঠিকই বলেছিল, চোখ বড় সাংঘাতিক জিনিস ! সেই সময় বাজারে একটা গানও বেরিয়েছিল, বলা কি যায় সহজে, বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা। চোখ ওই রকম করতে করতে এমন মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়ে গেল সব সময়েই করে চলেছি, অজান্তেই করে চলেছি।

পিতৃবন্ধু বিধুজ্যাঠার মাথায় মাথায় তিন মেয়ে। সব কটি মেয়েই বেশ সুন্দরী। পিতৃদেব একদিন সকালে বললেন বিধুবাবুর বাড়ি থেকে চট করে একবার গুপ্তপ্রেস পাঁজিটা নিয়ে এসো তো।

বিধুজ্যাঠার বাড়িতে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল বড় মেয়ে রেখা। জিজ্ঞেস করলুম, বিধুজ্যাঠা আছেন, বিধুজ্যাঠা ?

রেখা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, হ্যাঁ, বাবা আছেন।

রেখা পেছোতে শুরু করেছে। চোখে মুখে একটা ভয়, একটা কেমন যেন বিস্ময়ের দৃষ্টি। আমি এক পা-ও এগোইনি, দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমি বললুম, একবার ডেকে দাও তো, একবার ডেকে দাও তো।

রেখা প্রায় ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। যেতে না যেতেই বিধুজ্যাঠা এলেন, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। আদুর গা। সাদা মোটা পইতে বুকের এপাশ থেকে ওপাশ চলে গেছে। চোখ দুটো ভাঁটার মত লাল।

বাঁজখাই গলায় বললেন, কি চাই ?

সাধারণত এভাবে কথা বলেন না। অবাক হলুম। বললুম,

পাঁজি আছে, পাঁজি, বাবা একবার চাইলেন।

হ্যাঁ, আছে ছোকরা—বলে ঠাস করে গালে এক বিরাশি সিক্কার চড় হাঁকড়ালেন।

এ আবার কি? চড় আবার কবে থেকে পাঁজি হল! কিছু বোঝার আগেই আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, চল তোমার বাবার কাছে।

তিন মেয়ে রকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, অসভ্য ছেলে।

বাড়ির সামনের হারাধন মুদী দোকানের টাটে বসে বসেই চেল্লাতে লাগল, কি করেছে জ্যাঠামশাই, কি করেছে জ্যাঠামশাই?

আমি হাঁ হয়ে গেছি। অপরাধ জানলুম না ফাঁসিতে চলেছি।

বাবা বললেন, কি করেছিল কি, বিধুদা? জুতো পায়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছিল?

তার চেয়েও অনেক গর্হিত কাজ, চোখ দিয়ে আমার মেয়েদের অশ্লীল, কামার্ত ইঙ্গিত করেছে।

ইজ ইট?

ডিফেন্সের কোন সুযোগই পেলুম না। কিল, চড়, ঝাঁটা, জুতো, লাঠি। মিনিট দশেক শরীরের ওপর দিয়ে ভূমিকম্প চলে গেল। বড় বউদি এসে উদ্ধার করলেন। বড়দা বেরিয়ে এসে বললেন, কি হয়েছে কি?

বাবা আর বিধুজ্যাঠা দুজনেই সমস্বরে আমার অপরাধ পেশ করলেন।

বড়দা বললেন, ছি ছি, না জেনে শুনেই, এত বড় একটা ছেলের গায়ে হাত তুললেন? সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটা ছেলের গায়ে? জানেন না, ও গুরুতর একটা চোখের অসুখে ভুগছে। মেজর মিত্রর চিকিৎসায় আছে।

দুজনেই সমস্বরে বললেন, অ্যাঁ! বল কি? কই, তোমরা আগে তো কিছু বলনি! ছি ছি ছি।

বিধুজ্যাঠা আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ক্ষমা

কর বাবা। তুমি একবার আমার বাড়িতে চল। আমরা সবাই মিলে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, আজ আর আমার যাবার মত অবস্থা নেই জ্যাঠামশাই।

বিকেলের দিকে ভীষণ জ্বর এসে গেল। চোখ বুজিয়ে পড়ে আছি। সর্বঅঙ্গে বিষ ফোড়ার মত ব্যথা। বউদি এসে কপালে হাত রেখে বললে, দেখ কে এসেছে তোমাকে দেখতে?

চোখ খুলে দেখি রেখা।

ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। যা দেখেছি তাই যথেষ্ট। এখনও হয়তো আমার চোখ সেই ভাবেই নাচছে। আবার না জুতো খেতে হয়।

বউদি বললেন, তাকিয়ে দেখ কে এসেছে?

আমি ইচ্ছে করে প্রলাপ বকতে লাগলুম, না না, আমি আর যাব না, আর পাঁজি আনতে যাব না মা।

রেখা ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল, বউদি, আমিই দায়ী, আমিই দায়ী। কিছু হবে না তো? সেরে উঠবে তো? বউদি বললেন, সারা শরীর বিষিয়ে উঠেছে। তা ছাড়া বড় অভিমানী ছেলে, দেহের চেয়ে, মনে বেশি লেগেছে।

চার বছর পরে মুসৌরীর এক হোটেলে আমি আর রেখা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কাঠের মেঝের ওপর আমাদের স্যুটকেশ। তখনও খোলা হয়নি। সামনে কাঁচের জানালা। সকালের রোদে হিমালয়ে সোনা খেলছে। রেখার কাঁধে আমার একটা হাত। রেখার একটা হাত আমার কোমরে। রেখার মাথা আমার কাঁধে।

আমি বলছি, সেদিন জুতো খাইয়েছিলে, আজ অন্য কিছু খাওয়াও।

রেখা বলছে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন?

আমি বলছি, আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন?

চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। দরজার কাছ থেকে হোটেল-বয় বলছে, কফি, মেমসাব!

জীবন এক সার্কাস

হঠাৎ চোখে পড়ে গেল সাইনবোর্ড। সাবেক কালের পুরনো একটা বাড়ির দোতালায় হেলে আছে। পাশ দিয়ে পাতা মেলেছে বটের চারা। অদ্ভুত সাইনবোর্ড ঃ

স্বামী শিক্ষা কেন্দ্রে

বিবাহিত জীবনে

সুখী হইতে হইল

সাক্ষাত করুন

সময় ঃ সূর্যোদয় হইতে মধ্যরাত

মাঝারী মাপের গলিতে নির্জন একটি দোতলা বাড়ি।

সামনে খোলা বারান্দা। কাঠের রেলিং। জায়গায় জায়গায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। তেমন স্বাস্থ্যবান মানুষ নিচে কি হচ্ছে ঝুঁকে দেখতে চাইলে ভেঙে পড়ে যাবে। তার খাটানো রয়েছে, কাপড় জামা শুকোতে দেবার জন্যে। কাপড় কী তোয়ালের বদলে ঝুলছে খালি একটা খাঁচা। হয়তো এক সময় পাখি ছিল। সদর দরজা বেশ বড় মাপের। মজবুত দরজা। দীর্ঘকাল রঙ পড়েনি। কটা চেহারা। এক সময় খুব কায়দার বাড়ি ছিল। যত্ন আর পরিচর্যার অভাবে প্রাচীন।

বিবাহিত জীবনে কে না সুখী হতে চায়! আমিও চাই চাইলেই কী আর সুখী হওয়া যায়! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার বাসনার মতো দাম্পত্য জীবনে সুখী হবার ইচ্ছে। স্ত্রী আর পায়ের কড়া একই অভিজ্ঞতা। ভালো তো ভালো। মনের সুখে হাঁটা চলা। আউড়ে উঠল তো লেংচে বেড়াও। ঘষা মাজা ছাড়া কোনও দাওয়াই নেই। ঝামা দিয়ে ঘষে দাও দিন কতক, বাগে এল। আবার তেড়ে উঠল। বিবাহিত জীবনের ধরনধারণ আহার জানা হয়ে গেছে। অনেকটা ষড় ঋতুর মত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত। যখন যেমন তখন তেমন। সহ্য করার নামই বিবাহ। যখন যে

মূর্তিতে আবির্ভাব, সেইভাবেই আরাধনা। স্ত্রী যেন দশমহাবিদ্যা কালা ছিন্নমস্তা ধুমাবতী বগলা। কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও শূন্যাকারা হে।

বাড়িটাকে বড় ভালো লেগে গেল। যেন ইতিহাস। যেন কত কথা বলার জন্যে মুখিয়ে আছে। কড়া নাড়লুম বার কতক। ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল।

খোলাই আছে। দয়া করে ঠেলুন।

ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ভেতরে একটা বাগান আছে। আহা মরি কিছু নয়। তবে বাগান। কিছু ফুলও ফুটে আছে। নাম বলত পারব না। ফুলের জ্ঞান আমার খুবই কম।

ডান পাশেই একটা ঘর। এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বেঁটে-খাটো, কুস্তিগিরের মত চেহারা। চলার ধরন লাফিয়ে লাফিয়ে যেন স্প্রিঙের মানুষ। ফর্সা টুকটুবে গায়ের রঙ। মুখটি ভারি মিষ্টি। অথচ গলার স্বর বেশ গমগমে যেন মেঘ ডাকছে।

"কী চাই?"

"আজ্ঞে দাম্পত্য জীবনে···।"

"সুখ?"

"হবে না।"

"কোন্ সময়ে এলে হবে?"

"কোনও সময়েই নয়।"

"সে কী বাইরের সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে···।"

"ভুল কিছু লেখা নেই। আপনি সুখী হবেন না।"

"কেন?"

"আপনি কিঞ্চিৎ খেয়ালী ধরনের মানুষ। এই যে ভেতরে এলেন সদর দরজাটা খোলাই রয়ে গেল। কোথাও ঢোকার নিয়মটা কী? দরজা ঠেলে ঢুকবেন এবং ঢোকার পর সে দরজা বন্ধ করবেন। আপনি তা করেন নি। তার মানে আপনি আপনার স্ত্রীর অন্তরে

প্রবেশ করেছেন, কিন্তু যে পথে প্রবেশ করেছেন সে পথ খোলা রেখেছেন। বেড়াল ঢুকবে, এখন ওই খোলা পথে কুকুর ঢুকবে, গরু ঢুকবে, আপনার সাজানো বাগান তছনছ করে দেবে।”

“ আমি খেয়াল করিনি। যাচ্ছি সদরটা দিয়ে আসছি।”

“আপনি ভেতরে বসুন। আমি দিয়ে আসছি।”

বেশ মজার ঘর। মেঝেতে ফরাস পাতা। গোটা দুই তাকিয়া। বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। গোটা চারেক আশট্রে আর কোথাও কিছু নেই। এক দিকের দেয়ালে চোখের ডাক্তারের চেম্বারে যে ধরনের গোল নকশা, অ-আ কখ, এ বি সি ডি ঝোলে সেই রকম ঝুলছে। ভদ্রলোক কী চোখের ডাক্তার? সন্দেহ হল।

“একী, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন বসুন। আপনার নাম?”

“আমার নাম সুতপন।”

“আমার নাম জানেন?”

“আজ্ঞে না।’

“আমার নাম গদাধর রায়। সংক্ষেপে জি ডি আর।” ভদ্রলোক তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। যেন ওস্তাদের গান শুনতে বসেছেন। চওড়া ফুলপাড় ধুতির কোঁচা সামনে ছড়ানো। গায়ে ফিন ফিনে গিলে হাতা পাঞ্জাবি! এতক্ষণ পরে আমি “নমস্কার” বলে হাত জোড় করলুম। ভদ্রলোক হেসে বললেন, “ভুলে গিয়েছিলেন!”

অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, “সুযোগ পাই নি।”

“তাই কী? না ভদ্রলোক ভাবছিলেন সমস্ত কী না!”

“ঠিক তা নয়।”

“হাঁ। তাই। আপনি একটু অবিশ্বাসী ধরনের। আর অবিশ্বাসী ‘মানুষেরা’ দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে না।”

ভদ্রলোকের কথায় আমার ভুরুর কাছটা কুঁচকে গেল। এত সমালোচনা সহ্য করা যায় না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

"অল্পেই অসন্তুষ্ট হওয়া আপনার স্বভাব। তাই না?"

"তা বলতে পারি না। মনের মতো না হলে আমি বিরক্ত হই। মনের মতো রান্না, মনের মতো বিছানা, মনের মত আবহাওয়া মনের মতো মানুষ।"

"মনের মতো কথা।"

"মনের মতো রোজগার।"

"মনের মতো বাড়ি।"

"মনের মতো সাজ-পোশাক।"

"মনের মতো শরীর।"

"মনের মতো ব্যবহার।"

"মনের মতো মানসম্মান?"

"মনের মতো শহর।"

"মনের মতো শাসন-ব্যবস্থা।"

"মনের মতো চেহারা।"

"মনের মতো মাথার চুল।"

দুজনেই কোরাসে বলে উঠলুম 'মনের মতো, মনের মতো।' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার মনের মতো, তাই না' সুতপন বাবু? আপনি নিজে কতটা কার মনের মতো একবার ভেবে দেখেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তার মানে নিজেকে নিয়েই মশগুল হয়ে আছেন। আপন নাভির গন্ধে মৃগ পাগল।'

"সংসারের কথাও ভাবি। স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের কথা।"

"আপনি তাই মনে করেন: কিন্তু! হ্যাঁ একটা প্রশ্ন করি, কী করেন আপনি?"

"চাকরি।"

"তার মানে সকালে বেরনো রাতে ফেরা?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে আপনার দিন খুবই ছোট। বারো চোদ্দ ঘণ্টা

বাইরে। আট ঘণ্টা ঘুম। পরিবার পরিজনের জন্যে রইল মানে দুই কী তিন ঘণ্টা।"

"হিসেবে তাই দাঁড়াচ্ছে।"

"অর্থ চিন্তা আছে?"

"খুব আছে। এদিক টানলে ওদিক খালি যায়। ওদিক টানলে এদিক।"

"রোজগার আর একটু বাড়লে ভালো হয় তাই না?"

"একটু কেন? তিন-চার গুণ বাড়লে তবে যদি নিশ্চিন্তে রাতে একটু চোখ বুজনো যায়।"

"বাড়বে কী ভাবে? চাকরির উন্নতি? তাই না?"

"হ্যাঁ প্রোমোশান। তা না হলে আমাদের রোজগার আর বাড়বে কী করে! ব্যবসাদার হলে, যা হয়, হিঁয়া কা মাল হুঁয়া করে হয়ে যেত।"

"তার মানে, পরিবার-পরিজনের ভজনা নয়, ঈশ্বরের ভজনা নয়, চাকরির ভজনই চলছে। চলছে চলবে যদ্দিন না রিটায়ার করছেন। কিছু না দিলে কী কিছু পাওয়া যায় মশাই। দাম্পত্য জীবনে সুখী হবেন কী ভাবে। গাছ পুঁতলে তবেই না ফল! সুখের চারা পুঁততে হবে, সার দিয়ে, জল দিয়ে, বেড়া দিয়ে ঘিরে বড় করতে হবে। এ যুগের কজন তা করে মশাই!"

"আপনার এই পাঠশালা তাহলে খুলেছেন কেন? অকারণে সময়ের অপব্যয়।"

"আপনারা আসবেন বলে।"

"এসে কী ঘোড়ার ডিম হবে!"

"কিছুই হবে না, তবে একটা কাজ হবে, আয়নায় মুখ দেখা।"

"সে তো রোজ দেখি দাড়ি কামাবার সময়।"

"সে তো আসল মুখ নয়, মুখোশ। শুনুন ভেতরটা ঠিক ঠিক দেখতে পেলেই সুখী হবেন। সেই চেষ্টাই করুন।'

"আপনার সম্পর্কে আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে। কে আপনি?

কেন আপনি? কেন আপনার কাছে সবাই আসবে।'

"আসবে সাইনবোর্ডের জন্যে। একটা জিনিস দেখেছেন নিশ্চয়, পয়সার শব্দে সবাই ফিরে চায়। এই যে বললে সবাই ঘাড় ঘোরায়। সুখের আশা সবাই করে। সেই আশাতেই মানুষ আসবে।"

"আপনি কে?"

"আপনার মতোই একজন মানুষ, তবে একটু রকম-ভেদ আছে, আপনি বিবাহিত, আপনি অবিবাহিত।"

"কী করে বুঝলেন আমি বিবাহিত।"

"তাহলে এলেন কেন?"

"অদ্ভুত সাইনবোর্ড আর বাড়িটা দেখে।"

"তা ভালই করেছেন। তবে দাম্পত্য জীবন মানে। স্বামী-স্ত্রীর জীবন নয়। দুজন মানুষের সম্পর্কও দাম্পত্য জীবনের মধ্যে পড়ে। সেখানে শুধু আমি সেখানে ঝামেলা।

জি· ডি· আর হাসলেন, "সবাই চলে গেলেন। নতুন কেউ আর থাকতে আসেন নি।"

বাঁ দিকে বারান্দা। ডানপাশে সার সার ঘর। প্রথম ঘরটাতেই জি· ডি. আর· ঢুকলেন। বড় মাপের হলঘর। সুন্দর সাজানো। দেখলেই মনে হবে আসর চলছিল। এইমাত্র শেষ হল। শ্রোতারা এইমাত্র উঠে চলে গেছেন। চার দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি ঝুলছে।

একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জি· ডি আর বললেন কম। আমি আর তুমি হলেই যত গণ্ডগোল।"

"তা ঠিক। দুটো মানুষ এক ঠাই হলেই লাঠালাঠি।"

"আর সেই কারণেই আমি দর্শক। দেখে দেখেই জীবনের ষাটটা বছর কাটিয়ে দিলুম। আর দশটা বছর, বাস, মার দিয়া কেল্লা।"

"ঠিক বুঝলুম না।"

"আরে মশাই আর দশটা বছর বাঁচব।"

"সে তো বুঝলুম। দর্শক মানে!"

"খেলার মাঠে গেছেন কোনও দিন?"

"ছাত্রজীবনে গেছি।"

"গ্যালারিতে যারা বসে তারা মাঠে যারা খেলছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি খেলা জানে। তাদের মন্তব্য শুনলেই বোঝা যায়। তার অর্থ কী; খেলার মধ্যে থাকলে খেলা বোঝা যায় না। ভুল-ভ্রান্তি ধরা যায় না। দূরের চোখেই ধরা পড়ে। আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন।"

"কোথায়?"

"আসুন না। বলছিলেন বাড়ির আকর্ষণে এসেছিলেন। চলুন দোতলায়।"

দোতলায় ঢাকা বারান্দা। রঙীন কাঁচ বসানো ঐধরনের রঙ-বেরঙের কঁচে আর পাওয়া যায় না। বহুকা আগে ইংরেজ আমলে পাওয়া যেত। চওড়া বারান্দা মোজাইক করা। এখনও ঝকঝক করছে।

"এ বাড়িতে আর কেউ থাকেন না?"

এই আমার পিতামহ। সেকালের বিখ্যাত মানুষ। এর নামে কলকাতার একটা রাস্তা। আমার পিতামহী ছিলেন উন্মাদিনী। সারাদিন চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হত। ছাদের ঘরে। রাতে পিতামহ এসে চেন খুলে দিতেন। মুক্ত পিতামহী প্রথমে খুব খানিকটা ভাঙচুর করতেন। পিতামহ হো হো করে হাসতেন। পিতামহী তারপর পিতামহের গলা টিপে ধরার জন্যে সারা বাড়িতে ছুটে বেড়াতেন। শুরু হত চোর চোর খেলা। পিতামহের কাছে সেও ছিল মহানন্দের! তারপর এক সময় ধরে ফেলতেন। ধরেই বেধড়ক ঠ্যাঙাতেন। বাকি রাত ঘরের মেঝেতে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। আমরা জানলা দিয়ে দেখতুম। দুহাত মাটিতে। মাথা ঝুলছে সামনের দিকে। দু'পাশ দিয়ে চুল ঝুলছে। পিতামহী কাঁদছেন। আর পিতামহ বারান্দায় চেয়ারে আরামে বসে পোর্ট

খাচ্ছেন চুমুকে চুমুকে। এই হল এ বাড়ির দম্পতি নম্বর একের ইতিহাস।"

দ্বিতীয় আর একটি ছবির সামনে দাঁড়ালেন। "আমার পিতা। বড় বদরাগী মানুষ ছিলেন। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন। একটি মাত্রই কথা তাঁর মুখে নিয়ত শুনে এসেছি, কেন, কী হয়েছে? সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। কোনও বাধা মানতেন না। পাহাড়ী নদীর মত। বাধা পেলেই প্রবল। পাশেই আমার মায়ের ছবি। ছবি হয়েই কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, নয় তো ছু'জনের ব্যবধান ছিল উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুর। শেষের দিকে দুজনের বাক্যালাপ প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কোনও ক্রমে আমিই হতে পেরেছিলুম তাঁদেরএকমাত্র সন্তান।"

"কিছু মনে করবেন না আপনার জীবিকা?"

"ঈশ্বরের কৃপায় আমার অর্থের অভাব নেই। পূর্বপুরুষ অঢেল টাকা রেখে গেছেন। একমাত্র ছেলে—ফলে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অশান্তি হয়নি। কোর্ট-কাছারি করতে হয়নি।"

হঠাৎ ওই সাইনবোর্ডটা বাইরে ঝোলালেন কেন? আপনার তো কিছুই করার নেই।"

"খুব আছে। সাইনবোর্ড দেখে আপনার মত অনেকেই ঢুকে পড়েন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদের মগজ ধোলাই করেছি। যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের আমি স্পষ্ট বলেছি—ঝগড়াকুটে বউয়ের সঙ্গে এক ছাদের তলে বাস করার চেয়ে ফুটপাথে রাত্রিবাস ঢের ভালো। আরো বলি দাঁতের যন্ত্রণার একমাত্র দাওয়াই দাঁতটিকে সমূলে তুলে ফেলা। আর আপনার মত যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বলি, দাম্পত্য জীবনে সুখী হবার একমাত্র পথ—বিবাহ না করা।"

"এ তো আপনার অস্বাভাবিক চিন্তা।"

"অবশ্যই অস্বাভাবিক। পৃথিবীতে সুখ বস্তুটাই তো অস্বাভাবিক। সন্তান প্রসবের বেদনাটাই তো স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হল কাঁচি-কাটা করে বের করা। আমাকে সবাই পাগল বলে, কেন জানেন,

আমি পৃথিবীটাকে উল্টে দেখি। পৃথিবী তো পাল্টাবে না, আমি নিজেই উল্টে যাই।"

মেঝেতে দু'হাত পেতে ভদ্রলোক টুক করে শীর্ষাসন করে ফেললেন। তারপর সেই অবস্থায় দু হাতে হাঁটতে লাগলেন সারা ঘরময়।

আমি আর এক মুহূর্তও নয়। ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তায়! পাশেই পান-বিড়ির দোকান। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল মশাই?"

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, "সাংঘাতিক।"

ভদ্রলোক বললেন, "জি· ডি আরের নাম শোনেন নি? বিখ্যাত দল ছিল সার্কাসের। দলের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত। ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত আর একটি ছেলে। সেও মেয়েটিকে ভালবাসত পাগলের মত। একদিন রাতে ছেলেটি ট্র্যাপিজের দড়ি ছুরি দিয়ে আধকাটা করে রাখল, যাতে ভার পড়লেই ছিঁড়ে যায়। সে রাতে বিরাট শো। গ্র্যাণ্ড নাইট। গভর্নর দেখতে এসেছেন। আরও বড় বড় লোক। মেয়েটি একটার থেকে উড়ে আসছে পরীর মত। ছেলেটি সময় মত এগিয়ে দেবে আর একটি দড়ি। দিলও তাই। উড়ন্ত দেহের ভার পড়ামাত্রই ট্র্যাপিজ ছিঁড়ে মেয়েটি পড়ল গিয়ে গ্যালারির ওপরে! ঘাড় ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। জি ডি আর সেই থেকে পাগল। কখনও স্বাভাবিক কখনও অস্বাভাবিক।"

"নিন ঠাণ্ডা জল খান—"

হাত বাড়িয়ে কোল্ড ড্রিংকসের বোতল নিলুম। টুকটুকে লাল জল। কানের কাছে সার্কাসের ব্যাণ্ড বাজছে।